ড. জেকিল ও মি. হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ড. জেকিল ও মি. হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

অনুবাদ
আমীরুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৩৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

পঞ্চম সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আমীরুল ইসলাম

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0135-3

বই পড়ার আগে

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের কোনো লেখা পড়ে নি এমন সচেতন কিশোর-পাঠক পৃথিবীতে বিরল। কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁদের রচনা প্রসাদগুণে এমনই অভিনব, এমনই মৌলিক, এমনই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত যে আমরা লেখকের নাম ভুলে গিয়ে মনে রাখি শুধু তাদের লেখার কথা। তাদের সৃষ্ট চরিত্রের কথা।

স্টিভেনসন সেই বিরল গোত্রের একজন শক্তিমান লেখক। তিনি ট্রেজার আইল্যান্ডের স্রষ্টা। ট্রেজার আইল্যান্ডের লং জন সিলভার কিংবা জিমের অবিস্মরণীয় কাহিনীর স্বাদ থেকে বঞ্চিত এমন হতভাগ্য কিশোর খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্টিভেনসনের আরেকটি অবিস্মরণীয় কীর্তি ড. জেকিল ও মি. হাইডের কাহিনী। অভূতপূর্ব কল্পনাশক্তি, ঘটনার নাটকীয়তা, চরিত্র নির্মাণের উজ্জ্বলতা সর্বোপরি বিস্ময়কর রকমের এমন মৌলিক কাহিনী সৃজনশীল লেখকদের হাতে খুব কমই রচিত হয়েছে।

এই গল্পের লোভনীয় গল্প, চমৎকার আঁটসাঁট বাঁধুনী এবং স্টিভেনসনের জাদুকরী ভাষা এবং অসাধারণ বক্তব্য পাঠকদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে যুগের পর যুগ। এই গল্পে ভালো ও মন্দের সংঘাত দেখানো হয়েছে। সেই সংঘাতে ভালো ও মন্দের মধ্যে কে জয়লাভ করেছে—সে প্রশ্ন তোমাদের কাছে।

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের জন্ম ১৮৫০ সালে। মৃত্যু ১৮৯৪-এ। তিনি ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার। আজীবন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশে। ডাক্তারের

পরামর্শে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়, বায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্যে বহুবার তিনি সমুদ্র ভ্রমণ করেন।

স্বল্পায়ু জীবনে বহু বিচিত্র ধরনের রচনায় তিনি সমৃদ্ধ করেছেন ইংরেজি সাহিত্যকে। তার রচনাবলি সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে এখনো সমানভাবে আদৃত ও বরণীয়। স্বপ্ন ও কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অনাস্বাদিত, অভিনব, আশ্চর্য সব কাহিনী রচনা করেছেন।

ট্রেজার আইল্যান্ড (১৮৮৩), চাইল্ডস গার্ডেন অব ভার্সেস (১৮৮৫), কিডন্যাপড ও দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ড. জেকিল অ্যান্ড মি. হাইড (১৮৮৬), দি ব্ল্যাক অ্যারো (১৮৮৮) ইত্যাদি বইগুলো তার বহুমুখী প্রতিভার অম্লান কীর্তি। প্রতিটি বইই পৃথিবীর সর্বস্তরের পাঠকদের মুগ্ধ করেছে বছরের পর বছর ধরে। এখনো যেন নবীন-সতেজ-প্রাণের উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে স্টিভেনসনের প্রতিটি রচনায়।

'দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব ড. জেকিল এন্ড মি. হাইড'—একটি গল্প। ১৮৮৬ সালে গল্পটি স্টিভেনসন রচনা করেন। মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বিরাজমান। ভালো ও মন্দ। ড. জেকিল সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত একজন ব্যক্তিত্ব। রূপান্তরিত হয়ে তিনি মি. হাইডে পরিণত হন। হাইড অসৎ, খুনী, কুৎসিত এক ব্যক্তি। হাইডের মাধ্যমেই মানুষের ভিন্নসত্তার উদ্ভাবন করেছেন লেখক।

বইটি পড়লেই তোমরা সে-সব জানতে পারবে।

এই অমর গ্রন্থটির অনেক অনুবাদ বাংলা ভাষাতেও হয়েছে। তাহলে আবার নতুন করে অনুবাদ কেন? বইটি পড়ে এমনই ভালো লাগায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে, অনুবাদ করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। বাংলা ভাষার অনুবাদ গ্রন্থগুলো সবকটিই যে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এমন কথা বলা যাবে না—তবে আমি মূলের প্রতি সবিশেষ বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

বইটি শুধু কাহিনী জানার জন্যে পড়বে এমন নয়, বইটির মূল বক্তব্য বোঝারও চেষ্টা করবে তোমরা—এমনটি আশা করি।

আমীরুল ইসলাম

বন্ধ দরজার কাহিনী

মি. আটারসন পেশায় একজন আইনজীবী। খুব গম্ভীর এবং কড়া মেজাজের ভদ্রলোক তিনি। মুখে তার সচরাচর হাসি দেখা যায় না। লোকজনের সঙ্গে কখনো গায়ে পড়ে মেলামেশা করেন না। তার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম। কিন্তু যারা তার বন্ধু তাদের প্রতি তিনি খুবই হৃদয়বান, সহনশীল এবং আন্তরিক। তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মি. রিচার্ড এনফিল্ড। সম্পর্কে তাঁরা আত্মীয়। দুজনেই শহরের খুব পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

ছুটির দিন রোববারে দুজনে একসঙ্গে মাঝে-মধ্যে সান্ধ্যভ্রমণে বের হন।

এরকমই এক রোববারে লন্ডনের ছোট্ট কিন্তু ব্যস্ত রাস্তায় তারা ঘুরতে বেরিয়েছেন। আজ রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। দুজনেই তারা নিঃশব্দে, চুপচাপ হাঁটছেন। পূর্বদিকে রাস্তাটির একেবারে শেষ মাথায় একটি অদ্ভুত বাড়ির সামনে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন। বাড়িটি দোতলা কিন্তু দরজা জানালা নেই বললেই চলে। রংহীন ফ্যাকাশে দেয়ালটা প্রমাণ করে, বাড়িটি বহুদিন অব্যবহৃত। নিচের তলায় ভাঙাচোরা মলিন একটি দরজা। দরজায় না-আছে কলিং-বেল, না আছে কড়া। দেখে মনে হয়, গত এক যুগেও এখান দিয়ে কোনো লোক আসা-যাওয়া করে নি।

আটারসন ও এনফিল্ড বিপরীত দিকের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন। বাড়িটির সামনে এসে এনফিল্ড হাতের ছড়ি তুলে বললেন,

'এই দরজাটি তুমি কি কখনো ঠিকভাবে লক্ষ করেছ?'

আটারসন মাথা ঝাঁকালেন—হ্যাঁ, তিনি ইতিপূর্বে দরজাটি দেখেছেন।

'আমার মগজের মধ্যে কিন্তু গেঁথে আছে দরজাটি। সে এক দুঃখজনক ঘটনা, এক অদ্ভুত স্মৃতি আমার জীবনের!'

আটারসন বললেন, 'তাই নাকি? কী সেই ঘটনা?'

'সবটাই শোনাই তোমাকে।'

হাঁটতে হাঁটতে এনফিল্ড বলতে শুরু করলেন সেই ঘটনা।

একদিন শীতের রাত্রি। ঘন কুয়াশার আবরণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে লন্ডন শহরকে। কাজ শেষে ঘরে ফিরছি। রাত্রি তখন গভীর। রাস্তার পর রাস্তা— নিঃশব্দ, নীরব, নিঝুম। ল্যাম্পপোস্টের আলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। আশা করছি, হয়তো একটা পুলিশ-টুলিশ দেখা যাবে। ক্লান্ত-শ্রান্ত আমি হেঁটে যাচ্ছি। এমন সময় চোখে পড়ল দুটি মূর্তি। একজন বেঁটে মতো লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে পূর্বদিকে। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসছে আট দশ বছরের একটি মেয়ে।

দুজনেই এসে রাস্তার মাঝখানে ধাক্কা খেল। হায়, তারপরেই ঘটল সেই ভয়াবহ ঘটনা।

লোকটা নির্বিকারভাবে মেয়েটিকে পায়ের নিচে মাড়াতে লাগল। মেয়েটি কাতরভাবে চিৎকার করছে। লোকটা মানুষ নয়, যেন এক হিংস্র জন্তু। চেহারাও তার কুৎসিত। আমি দৌড়ে গিয়ে লোকটার শার্টের কলার চেপে ধরলাম। ইতিমধ্যে মেয়েটির চিৎকারে কয়েকজন লোক এসে জড়ো হয়েছে রাস্তায়। এদের মধ্যে মেয়েটির আত্মীয়রাও রয়েছে।

লোকটি নির্বিকার। আমার দিকে একবার শীতল চোখে তাকাল সে। ভয়ঙ্কর তার দৃষ্টি। কিন্তু কলার ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা তার নেই। এরই মধ্যে একজন ডাক্তার এলেন। মেয়েটিকে পরীক্ষা করে জানালেন, আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। তবে ও ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ক্ষুদ্রাকৃতি বীভৎস সেই লোকটির প্রতি আমাদের সকলেরই ঘৃণা ও রাগ হচ্ছিল। লোকজন তার উপরে মহাক্ষিপ্ত। ডাক্তারও লোকটাকে প্রায় মারতে যায় আর কী!

ক্ষুদে লোকটা কিন্তু শান্ত ও নির্বিকারভাবে সব দেখছিল। একেবারে আস্ত জানোয়ার যাকে বলে। ধীর-স্থিরভাবে সে বলল,

'ঘটনাটির জন্য আমি দুঃখিত। এই দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে আপনারা যদি কোনো কিছু দাবি করেন আমি দিতে রাজি আছি। আপনারাই বিচার করুন এবং আমাকে মুক্ত করুন।'

সকলে মিলে ঠিক করা হল যে, লোকটি মেয়েটির আত্মীয়দের একশ' পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। লোকটি এতে রাজি। কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

তারপরের ঘটনাটি ঐ দরজা নিয়ে। লোকটি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঐ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বের করল। তারপর সেই

প্রাচীন গরাদ খুলে প্রবেশ করল সেই অদ্ভুত বাড়িতে। আমাদের বাইরে দাঁড়াতে বলল। কিছুক্ষণ পরেই নগদ দশ পাউন্ড ও বাকি টাকার একটা চেক নিয়ে লোকটি ফেরত এল। চেকে যার সই রয়েছে তাঁর নাম আমি বলতে চাই না। তিনি একজন নামকরা ব্যক্তি। তাঁর নাম এই শহরের সবাই জানে। চেকটি লেখা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। স্বাক্ষরও নিখুঁত, পরিষ্কার।

এ-সব সত্ত্বেও পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হল। কারণ শেষ রাতে অন্যের বাড়িতে ঢুকে একশ' পাউন্ডের একটা চেক সংগ্রহ করা যা-তা ব্যাপার নয়।

সেই ভাবলেশহীন, কিম্ভূতকিমাকার লোকটাকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। চেকটি জাল নয়। ব্যাংক না খোলা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি।'

লোকটা তখনো নিরুত্তাপ, নির্বিকার।

আমরা সবাই মিলে আমার বাসাতেই বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। সকালে ব্যাংকে গেলাম। আমার ঘোরতর সন্দেহ যে, চেকটা জাল। কিন্তু আশ্চর্য! চেকটা ভাঙাতে কোনো কষ্টই হল না। চেকে কোনো ভেজাল নেই।

এই পর্যন্ত শুনে আটারসন বললেন, 'আশ্চর্য ঘটনা। বল কী তুমি?'

এনফিল্ড বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্য। অমন বাজে লোক আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। কিন্তু যার চেক সে নিয়ে এল তিনি একজন সত্যিকার নামজাদা ব্যক্তি। আমার ধারণা এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। নামকরা ব্যক্তিটি হয়তো তার কোনো অপরাধের খেসারত দিচ্ছেন। ব্ল্যাকমেল যাকে বলে। সেই থেকে এই দরজাঅলা বাড়িটিকে আমি 'ব্লাকমেল হাউস' বলি।

হাঁটতে হাঁটতেই আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ বাড়িটি সম্পর্কে আর কিছু জানো কি তুমি?'

'না। জানার আগ্রহও আমার নেই। এমনিতে ওটাকে বাড়ি বলে মনে হয় না। কাউকে কখনো ঢুকতে বা বের হতে দেখি না। ওপর তলায় জানালা আছে। কিন্তু নিচের তলায় তাও নেই। মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখি। অর্থাৎ লোকজন হয়তো থাকে। এই বাড়িটির কোথায় শুরু কোথায় শেষ কিচ্ছু বলতে পারি না।'

দুজনে এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন।

'এনফিল্ড।'

ডাক দিলেন আটারসন।

'আমি একটাই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।'

'বল!'

'মেয়েটিকে আহত করল যে ভয়ঙ্কর লোকটি তার নাম কি জানা আছে তোমার?'

'হ্যাঁ। তার নাম হচ্ছে হাইড।'

'হুম। লোকটি দেখতে কী রকম একটু বলতে পার কি?'

তাকে বর্ণনা করা খুব সোজা নয়। তার আচার-আচরণে অদ্ভুত ব্যাপার আছে। চেহারাটাই খাপছাড়া—দেখলেই ঘৃণা হয়। কদর্য, বিশ্রী—ঘৃণা না করে উপায় নেই। কিন্তু কেন যে ঘৃণা হয় তাও ঠিকভাবে বলতে পারব না। শরীরটাও বিকৃত। দেখতে ভয়ঙ্কর। অন্যদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। না ভাই, ওর চেহারার বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কুৎসিত চেহারাটা আমার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে।'

আবারও কিছুক্ষণ একসঙ্গে হাঁটলেন তাঁরা। আটারসন হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি নিশ্চিত যে লোকটার কাছে চাবি ছিল।'

'অবশ্যই।'

'বাড়ির মালিকের নাম আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি নি এনফিল্ড। কারণ আমি ভদ্রলোককে ভালোমতো চিনি। কিন্তু মি. হাইডের যে ঘটনাটি তুমি বললে সেটি খুব আশ্চর্যের। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব জানতে চাইছি আমি।'

এনফিল্ড বললেন, 'যা যা ঘটেছিল আমি তার একটুকুও বাড়িয়ে বলি নি। লোকটার কাছে এখনো চাবি আছে। কারণ কিছুদিন আগেও তাঁকে আমি দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি।'

আটারসন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ মেরে গেলেন। আপনমনে কী যেন ভাবছেন তিনি। তারপর সেই রহস্যময় ঘটনা নিয়ে তাদের মধ্যে আর কোনো আলাপ হল না।

সান্ধ্যভ্রমণ শেষে যে যার বাড়িতে ফিরে গেলেন।

হাইডের সন্ধানে

সেই রাত্রে আটারসন ঘরে ফিরলেন খুব গম্ভীর ও চিন্তিতভাবে। তেমন কিছু খেতেও পারলেন না। কেমন এক অস্বস্তি লাগছে তাঁর। এমনিতে রোববারে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি পড়াশুনো করেন। পাশের বাড়ির গির্জার ঘণ্টা শুনে ঘুমাতে যান বিছানায় গভীর রাতে।

আজ খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলেন চেম্বার রুমে। আলমারি খুলে একটা ফাইল বের করলেন। ফাইলের ওপর লেখা আছে : ড. জেকিলের উইল।

আটারসন উইলখানা বের করে খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। হেনরি জেকিল-এর মৃত্যু ঘটলে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী এডওয়ার্ড হাইড সব পাবেন। শুধু তাই নয়—যদি কোনো অজ্ঞাত কারণে জেকিল নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁর কোনো খবর না পাওয়া যায় তাহলে হাইডই তার উত্তরাধিকারী হবেন।

আটারসন এই উইলটা পছন্দ করেন নি। উইলের শর্তগুলো তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। ড. জেকিল তার মক্কেলই শুধু নন, একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। বন্ধু কেন যে এরকম বিচিত্র উইল করেছেন আটারসনের কাছে তা বোধগম্য নয়। উইলটাকে পাত্তা দেন নি বলেই মন দিয়ে পড়ে দেখেন নি। আজকেই প্রথম তিনি হাইডের কিছুটা পরিচয় পেলেন। এনফিল্ডের মুখে হাইডের বর্ণনা শুনে আরও চিন্তিত হলেন তিনি। উইলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে। উইলটা আলমারিতে রাখতে রাখতে আটারসন

ভাবলেন—মনে হয়েছিল এটা নিছক পাগলামি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ড. জেকিল কি কোনো বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন?

এইসব ভাবতে ভাবতে আলো নিভিয়ে তিনি গায়ে কোট চাপালেন। ক্যাভেন্ডিশ স্কোয়ারে বন্ধু ল্যানিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ল্যানিয়ন তাঁর এবং জেকিল দুজনেরই প্রিয় বন্ধু। উইলটির ব্যাপারে ল্যানিয়নের হয়তো কিছু জানা থাকতে পারে।

ড. ল্যানিয়ন তখন খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আইনজীবী আটারসনকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁরা ছাত্র-জীবনের পুরনো বন্ধু। পরস্পরের প্রতি তাঁরা খুবই শ্রদ্ধাশীল। একে অপরের সঙ্গও খুব পছন্দ করেন। টুকিটাকি আলাপ আলোচনার পর আটারসন আসল বিষয় পাড়লেন।

'ল্যানিয়ন—তুমি আর আমি বোধহয় হেনরি জেকিলের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু, তাই না?'

'হ্যাঁ, তবে আজকাল তাঁর সাথে দেখা হয় না।'

'আশ্চর্য, তোমরা শুধু বন্ধুই নও, এক পেশার মানুষ। দুজনেই ডাক্তার। কিন্তু দেখা হয় না কেন?'

ড. ল্যানিয়ন বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু গত দশ বছর ধরেই জেকিলের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা কমে এসেছে। ও একটু বেশিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ। শেষ দিকে ওর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিতে শুরু করে। সে আজগুবি আজগুবি তথ্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক করত। এই ধরনের পাগলামি আমার সহ্য হত না। পুরনো দিনের কথা মনে করে আমি যোগাযোগের চেষ্টা করলেও ওর দেখা পাওয়া মুশকিল।'

'যাক, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।'

আটারসন বুঝলেন, দুই বন্ধুর হয়ত মতের গোলমাল রয়েছে। তাই সম্পর্ক কিছুটা খারাপ। ল্যানিয়ন কথা বলতে বলতে রাগে লাল হয়ে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে আটারসন জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, হাইড বলে জেকিলের কোনো বন্ধুকে তুমি চেন?'

'হাইড? কই, কখনো তো এর নাম শুনি নি।'

এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করেই আইনজীবী ফিরে এলেন তাঁর বাসায়। সারারাত বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। নিঃশব্দ রাত্রি। বাইরে দু'একটা ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে। এনফিল্ড যে ঘটনাটি বলেছে ঘুরে ফিরে সেই কথাই মনে হতে লাগল। একটা নির্জন অন্ধকার মাঠে মানুষরূপী একজন বিশালকায় শয়তান একটি মেয়েকে পায়ে দলে দলে যাচ্ছে। এইরকম একটা দুঃস্বপ্ন তিনি বারবার দেখতে লাগলেন। আবার কখনো দেখলেন, তাঁর বন্ধু সুসজ্জিত বিছানায় শুয়ে সুখ-স্বপ্নে বিভোর। আর সেই

শয়তান দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল। আর বন্ধু বেচারা শয়তানের কথায় ওঠ-বস করছে। যেন একটা অশুভ ছায়া ভর করেছে জেকিলের উপর।

এইসব নানাবিধ স্বপ্ন দেখতে দেখতে রাত্রি পার হয়ে গেল। ভোর ছয়টায় যখন গির্জার ঘণ্টা বাজছে তখনো আটারসনের চিন্তা-চেতনায় ভেসে বেড়াচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর মানুষটির অবয়ব। কে এই হাইড? তাঁকে দেখার এক তীব্র কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে রইল আটারসনের মন। চেহারাটা কি তার জ্যান্ত শয়তানের মতো বীভৎস? হাইড কি কোনো হিংস্র নরপশু? হাইডের সঙ্গে কোনো রহস্যময় সম্পর্ক আছে ড. জেকিলের? একবার হাইডের সঙ্গে দেখা হলেই রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা যেত। সদাশয় ড. জেকিল কেন রহস্যময় একটি উইল তৈরি করলেন তার কারণও জানা যেত হয়ত।

হাইড যেন তাড়া করে ফিরতে লাগল আইনজীবী আটারসনকে। হাইডের সঙ্গে দেখা হতেই হবে। এরকম তীব্র আকাঙ্ক্ষায় জ্বলজ্বল করতে লাগলেন তিনি।

সেইদিন থেকেই আটারসন সেই অদ্ভুত বাড়ির নড়বড়ে রহস্যময় দরজাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করলেন। দিনের ব্যস্ত সময়ে কিংবা রাতের নির্জন অবকাশে যখনই তিনি সময় পান তখনই বাড়িটির আশেপাশে একবার ঘুরে আসেন।

তীক্ষ্ণ-সন্ধানী চোখে খুঁজে বেড়ান প্রত্যাশিত সেই চরিত্রটিকে। অবিরাম চেষ্টায় একদিন তিনি সফল হলেন।

ভেজা ভেজা কুয়াশাঘেরা রাত্রি। রাস্তাঘাট নির্জন। কোনো জনমানুষের সাড়া নেই। দুরন্ত বাতাসের গতি থেমে আছে। ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলো-আঁধারীর খেলা এখানে ওখানে। রাত তখন দশটা বাজে প্রায়। দোকানপাট সব বন্ধ। কোনো কোনো বাড়ি থেকে গৃহকর্মের টুকিটাকি কাজের শব্দ ভেসে আসছে।

এমন সময় আটারসনের কানে ভেসে এল দ্রুত পদশব্দ। আটারসন নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করলেন। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। পায়ের শব্দ দ্রুত নিকটবর্তী হল। তিনি দেখতে পেলেন, যাকে তিনি খোঁজ করছেন, সেই লোকটিই দ্রুত এগিয়ে আসছে দরজাটির সামনে। ছোটখাটো গড়নের একটি লোক। খুব সাধারণ ঢিলেঢালা পোশাক পরনে। খুব দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে তিনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে চাবি বের করলেন। ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে তিনি তাকাচ্ছেন না। চোখে মুখে তার কেমন একটা ভয় ভয় ভাব।

আটারসন তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে লোকটির কাঁধে হাতে রাখলেন।

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামই কি মি. হাইড?'

লোকটা চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিলেন নিজেকে। কোনো দিকে না তাকিয়ে শীতল স্বরে তিনি বললেন,

'হ্যাঁ, আমিই হাইড। আমার সঙ্গে কি কোনো দরকার আছে আপনার?'

আটারসন বললেন, 'না, আপনি তো বাড়ির ভেতরে যাচ্ছিলেন—আমি ড. জেকিলের একজন পুরনো বন্ধু। আমার নাম আটারসন—গন্ট স্ট্রিটে থাকি। হয়ত আমার নাম আপনিও শুনে থাকবেন। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন জেকিলের সঙ্গেও একটু দেখা করে যাই।'

'কিন্তু জেকিল তো বাড়িতে নেই। তার সঙ্গে তো দেখা হবে না।'

হাইড তখন চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করছেন। মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

সে কথার জবাব না দিয়ে আটারসন বললেন, 'তার আগে একটা অনুরোধ করব। অনুরোধ রাখবেন কি?'

'চেষ্টা করব। বলুন।'

'আপনি আমার দিকে একটু মুখ তুলে তাকান।'

হাইড দ্বিধাগ্রস্তভাবে আটারসনের দিকে তাকালেন। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারা অপলকে।

'আশা করি, আপনাকে চিনতে আর কখনো ভুল হবে না আমার। আপনাকে আমার দরকার হতে পারে।'

হাইড জবাব দিলেন, 'যাক ভালোই হল আমাদের চেনা পরিচয় হয়ে। আমার ঠিকানা রেখে দিন।'

লোকটা সোহো স্ট্রিটের ঠিকানা লিখে একটি কার্ড দিলেন আটারসনকে।

আটারসন ভাবলেন, ভালোই হল ব্যাপারটা। কিন্তু এই লোকটি জেকিলের উইলের খবর কি জানে? ঠিকানা দেয়ার মধ্যে অন্য কোনো অভিসন্ধি নেই তো?' তারপর হাইড হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বলুন তো' আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'

'আপনার বর্ণনা শুনে।'

'কে বর্ণনা দিল?'

'আমাদের উভয়েরই বন্ধু, এমন কারো কাছ থেকে?'

'উভয়ের বন্ধু!' হাইডের কণ্ঠস্বরে অবাক ভাব।

'কারা তারা?'

'যেমন ধরুন, ড. জেকিল!'

'তিনি এই কথা বলতে পারেন না।'

হাইড এক ঝলক রাগ করেই বললেন, 'মিথ্যে বলছেন আপনি। আপনার কাছ থেকে মিথ্যা শুনব ভাবতেই পারি নি।'

আটারসন বললেন, 'কথাটা বিনীতভাবে বললে হয় না কি?'

এই শুনে হাইড বিকট হাসিতে ফেটে পড়লেন। তার গলার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। হাসির ভঙ্গিটাও অত্যন্ত কুৎসিত। বন্য হাসির ধ্বনি তুলে ক্ষিপ্রভাবে অতিদ্রুত দরজা খুলে তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আটারসন কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, হায় জেকিল, এরকম দুষ্টু আত্মা ও শয়তানের মতো বীভৎস চেহারার একটা লোক তোমার বন্ধু।

আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে আটারসন কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। তারপর শান্ত শীতল সেই রাস্তায় ধীরে ধীরে একপা দুইপা ফেলে হাঁটতে লাগলেন। খুবই চিন্তিত এবং ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাঁকে। কপালে হাত বুলাতে বুলাতে হাঁটছেন তিনি। হাইডকে দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আপাতত ইতি ঘটেছে। আদিম, বন্য, বীভৎস এক চরিত্র হাইড। খর্বাকৃতি, বিশ্রী, বিকলাঙ্গ তাঁর চেহারা। ফ্যাসফ্যাসে, কর্কশ, ভাঙা কণ্ঠস্বর তাঁর। একই সঙ্গে ভীরু ও সাহসী মনে হচ্ছিল হাইডকে। বিরক্তিকর এই লোকটিকে দেখার পর ভয় ও ঘৃণার সংমিশ্রণ হল আটারসনের মনে। লোকটিকে দেখে কি মানুষ মনে হয়? আদিম, বন্য তাঁর চেহারা। হাইডের কাছ থেকে যে কোনো বিপদেরই আশঙ্কা করা যায়। জেকিলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন আটারসন। জেকিল যে গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছেন এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ রইল না তাঁর মনে।

এইসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত পায়ে হাঁটছিলেন আটারসন। টানা রাস্তাটার এক মাথায় পুরনো কিন্তু অভিজাত একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বিখ্যাত এবং কৃতী ব্যক্তিরা এই রাস্তায় বসবাস করে। সবচেয়ে সুন্দর ও বিশাল বাড়িটিতেই থাকেন ড. জেকিল। বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায় বাড়িটির ঐশ্বর্য ও রুচিস্নিগ্ধতার পরিচয়। সারা বাড়ি জুড়ে শীতের কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার রাত্রির গাঢ় ছায়া।

আটারসন ধীরে ধীরে গিয়ে বাড়িটার সদর দরজায় কড়া নাড়লেন। ভালো পোশাকপরা একজন বৃদ্ধ ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল।

আটারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে পুল, ড. জেকিল কি বাসায় আছেন?'

পুল তাকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে ভেতরের ঘরে নিয়ে বসাল। দীর্ঘ ছাদ, চওড়া দেয়ালঘেরা চমৎকার ঘর। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে গনগন করে। খুব আরামদায়ক পরিবেশ।

'আপনি একটু বসুন আটারসন। আমি দেখছি উনি ভেতরের ঘরে আছেন কি না?'

পুল চলে গেলে আটারসন একটু আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে আগুনের সামনে বসলেন। তার বন্ধুর এই ঘরে তিনি বহুবার এসেছেন। আগুনের উত্তাপে শরীরটা একটু ঝরঝরে হয়ে এলেই আটারসনের মনে পড়ল হাইডের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনাটি। হাইডের ভয়ঙ্কর আদিম চেহারাটা মনে পড়তেই আতঙ্কে ছেয়ে যায় তার সর্বশরীর। ফায়ার প্লেসের আগুনের শিখায় উজ্জ্বল আসবাবপত্রের একটা ছায়ারাজি তৈরি হচ্ছে ওপরের ছাদে। আটারসনের তাই দেখে মনে হল, যেন কোনো অজানা বিপদ আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে।

পুল ফিরে এলে আরামের আবেশ ভেঙে নড়েচড়ে উঠলেন আটারসন। পুল জানাল, ড. জেকিল বাড়িতে নেই।

আটারসন তখন বললেন, 'কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যে, মি. হাইডকে বাড়ির পেছন দিকে পুরনো দরজা দিয়ে জেকিলের গবেষণাগারে ঢুকতে দেখলাম।

জেকিল বাড়িতে না থাকলেও হাইড কি এভাবে যাওয়া-আসা করে। বিশেষ করে জেকিলের গোপন গবেষণাগারে।'

পুল বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, হাইড সাহেবের কাছেও একটা চাবি আছে। তিনি এভাবে যাওয়া-আসা করেন।'

'ঐ লোকটিকে তোমার মনিব খুব পছন্দ করেন বলে মনে হচ্ছে, পুল।'

'জ্বী স্যার। আমাদের তিনি বলেছেন, আমরা যেন তাঁর কথা মান্য করে চলি। তাকেও যেন আমরা মনিবের মতো সম্মান করি।'

'কিন্তু মি. হাইডকে কখনো আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

'না স্যার, তাঁকে দেখার কথাও না। তিনি তো এখানে থাকেনও না। খাওয়া-দাওয়াও করেন না। বাড়ির এদিকটাতে আসেনও না। বেশিরভাগ সময় তিনি গবেষণাগারের ছোট্ট দরজা দিয়ে ঢোকেন। ওখানেই তাঁর আনাগোনা।'

'ঠিক আছে পুল। আজ তবে আসি।'

'শুভ রাত্রি স্যার।'

আটারসন চিন্তিতভাবে, ভারি হৃদয় নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন। মনে মনে ভাবলেন, ড. জেকিল নিশ্চিতভাবেই কোনো বিপদে পড়েছেন। একেবারে অতল খাদে। ড. জেকিল যখন যুবক, তখন খুব দুরন্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই তখনকার কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এখন। হয়ত হাইডেরও কোনো পাপ আছে। যে পাপের তুলনায় জেকিলের পাপ খুবই অল্প। অথচ এই হাইড লোকটা সম্পূর্ণভাবে যেন গ্রাস করে ফেলেছে জেকিলকে।

অতীত স্মৃতি একবার রোমন্থন করার চেষ্টা করলেন আটারসন। নাহ্, ড. জেকিলের জীবনে এমন কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না যার জন্য তাঁকে কোনো খেসারত দিতে হতে পারে। সকলেই ড. জেকিলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তবে এই হাইডের উদয় হল কোত্থেকে? হাইডের কথা মনে পড়তেই আটারসনের হৃদয়টা বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল। হাইড যদি উইলের কথা জানতে পারে তবে হয়ত সর্বনাশ হতে পারে। বলা যায় না লোকটা যে-রকম বীভৎস ও পশুর মতো ভয়ঙ্কর ও বন্য তাতে অর্থের লোভে নিশ্চিতভাবে জেকিলকে হত্যাও করতে পারে। জেকিল যদি আসল ব্যাপারটা খোলসা করত তবে হয়ত কিছু করা যেত!

উইলের অদ্ভুত শর্তগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে আটারসন টের পেলেন— এ এক দুর্বোধ্য রহস্য। উইলটাকে আরও গোপনীয়ভাবে রাখতে হবে। এই উইলের কথা কেউ যেন টের না পায়।

ড. জেকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পনেরো দিনের মাথায় ড. জেকিল তাঁর সুখ্যাত নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন পুরনো পাঁচ-ছজন বন্ধুকে, তাঁর সেই প্রাসাদোপম বাড়িতে। প্রত্যেক অতিথি সমাজে গণ্যমান্য, মেধাবী ও সুপরিচিত। জেকিলের বাসায় কোনো ভোজসভায় আটারসনের আমন্ত্রণ বাদ যায় না কখনো, এবারও তাঁর অন্যথা হয় নি। এরকম বহু ভোজসভায় আটারসন ইতিপূর্বে এসেছেন। এবং খুব আনন্দলাভ করেছেন।

সকলে মিলে গল্প-গুজব, হাসি-তামাশায় মাতিয়ে তোলেন সুন্দর পরিবেশটাকে। অভিজাত ড্রইংরুমটি ঝলমল করতে থাকে তখন। আইনজীবী আটারসন বরাবরই কথা কম বলেন, পেছনের সারিতে বসে আনন্দ উপভোগ করেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে, আড্ডার পরে অতিথিরা একে একে বিদায় নিল। ড. জেকিল তখন আটারসনের সঙ্গে ড্রইংরুমে আগুনের ধারে বসলেন। জেকিলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর হবে। দীর্ঘদেহী, শক্ত-সমর্থ গড়ন, আত্মবিশ্বাসী, শান্ত-সৌম্য চেহারা। আটারসনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে আটারসনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। আগুনের উত্তাপ গ্রহণ করছেন তাঁরা। আটারসনই প্রথমে মৌনতা ভাঙলেন।

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা রয়েছে জেকিল। বিশেষ করে তোমার সেই উইলটার কথা মনে আছে কি?'

লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, জেকিল এই প্রসঙ্গটি পছন্দ করলেন না। চেহারায় তাঁর বিরক্তির ছাপ।

নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'বেচারা আটারসন! আমার মতো মক্কেল নিয়ে তুমি বিপদেই পড়েছ দেখছি। বন্ধু হিসাবে আমাকে তুমি গভীরভাবে ভালোবাস বলেই বিব্রত হচ্ছ। সে আমি বুঝতে পারি। তোমার মতো ল্যানিয়নও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার বৈজ্ঞানিক মতামত নিয়ে সেও খুব বিচলিত হত। তুমি তো জানো, তার আবার শিক্ষার অহঙ্কার রয়েছে। সে আমার মতামতকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। আমি জানি ল্যানিয়ন খুব ভালোমানুষ। আমাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু তাঁর মতো অপমানজনক আঘাত আমাকে কেউ করে নি।'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো, তোমার উইলে আমার কোনো আগ্রহ নেই ড. জেকিল?'

আটারসন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে না গিয়ে সরাসরি আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

'উইলের কথা বলছ? হ্যাঁ, তাতে তোমার সায় নেই—একথা তো তুমি আগেও বলেছ আমাকে।' 'আমি আবারও সেই কথাই বলতে চাই। ইদানীং তোমার ঐ হাইড সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় জানতে পেরেছি আমি।'

ড. জেকিলের সৌম্য চেহারাটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। উজ্জ্বল চোখে নেমে এল কালো ছায়া।

'এইসব বিষয়ে কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। বোধহয় আগেও আমরা একদিন একমত হয়েছিলাম যে, এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব না।'

'কিন্তু—' আটারসন বললেন, 'যা শুনেছি তা খুব ভয়ঙ্কর বলেই মনে হয়েছে।'

ড. জেকিল তখন হতাশ কণ্ঠস্বরে এলোমেলোভাবে বললেন, 'তাতে কিচ্ছু বদলাবে না। আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ না। আমি খুবই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে আছি। আমার পরিস্থিতি এখন রহস্যময়, অদ্ভুত, ঘোলাটে। কথা বলে এর কোনো মীমাংসা হবে না।'

'জেকিল'—

আটারসন বললেন, 'তুমি আমাকে ভালো করেই চেন? আমাকে তুমি বিশ্বাসও করতে পার। সব যদি খুলে বলা যায় তবে হয়ত তোমাকে সাহায্যও করতে পারি আমরা।'

'তোমাকে ধন্যবাদ আটারসন। তোমার মতো ভালো লোক হয় না। সে আমি বিশ্বাসও করি। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাষাও জানা নেই আমার। তোমার চেয়ে বেশি আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যত গুরুতর মনে করছ ব্যাপারটিকে, আসলে তত নয়। এর মধ্যে আমার বিপদের আশঙ্কাও নেই। তুমি যখন জানতেই চাচ্ছ তখন এটুকু বলতে পারি—যে কোনো মুহূর্তে, আমি যদি ইচ্ছা করি, হাইডের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া

সম্ভব। মুছে যাবে তার অস্তিত্ব। সত্যি বলছি, তুমি বিশ্বাস কর। আমার মঙ্গল কামনার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুধু একটু অনুরোধ আটারসন—

ব্যাপারটা খুবই মামুলি। নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি চাই না যে, ব্যাপারটি নিয়ে খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হোক।'

আটারসন আর কিছু বললেন না। গনগনে আগুনের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন।

'ঠিক আছে, আমি সন্দেহ মুক্ত। তুমি যে ভালো আছ সেটাই নিশ্চিন্তি।' এই বলে আটারসন পা বাড়ালেন।

ড. জেকিল উঠে দাঁড়িয়ে পথ আটকালেন। কাতর স্বরে বললেন,

'তুমি যখন জানতেই চাইছো, তখন দু-একটা কথা না বললেই নয়। হাইডের ব্যাপারে আমার কৌতূহলের শেষ নেই। এ বিষয়ে আমার স্বার্থও আছে। আমি জানি, তোমার সঙ্গে হাইডের দেখা হয়েছিল। সে-ই একথা আমাকে বলেছে। সে বোধহয় তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।

হাইডের ব্যাপারে আমার অপরিসীম আগ্রহ। আটারসন তোমার কাছে একটাই অবুরোধ—আমি যদি না-থাকি তবে হাইডের স্বার্থ তুমি দেখবে। তাকে সাহায্য করবে। কথা দাও তুমি। অঙ্গীকার করো—আমার অবর্তমানে হাইডকে তুমি তার পাওনা আদায় করে দেবে। তোমাকে যদি সব খুলে বলতে পারতাম, আমি নিশ্চিত তুমি আর আপত্তি করতে না। তোমাকে যদি সব বলতে পারতাম। আমার অবর্তমানে তুমি হাইডকে সাহায্য করবে, যদি প্রতিশ্রুতি দাও তবে আমার মন থেকে ভারী একটা পাথর নামবে।'

আটারসন জানালেন, 'দেখো, তাকে পছন্দ করব এমন কথা তো দিতে পারি না।'

ড. জেকিল আটারসনের হাত দুটো ধরে বললেন, 'আমি সে-কথা বলছি না। আমি তার জন্য ন্যায়বিচার কামনা করছি। আমি যখন থাকব না, তখন আমার জন্যেই তুমি ওকে সাহায্য করো।'

আটারসন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। তার জন্য আমি যথাসাধ্য করব। আমি কথা দিচ্ছি।'

কেরু হত্যারহস্য

প্রায় এক বছর পরের কথা।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি।

ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, নৃশংসতম এক হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে লন্ডনের অধিবাসীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। নিহত হয়েছেন সমাজের সভ্রান্ত, উচ্চপদে আসীন বিশিষ্ট এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে যা জানা গেল তা এই—

কোনো বাড়ির এক কাজের মেয়ে। বাড়িতে সে একাই ছিল তখন। বাড়িটা নদীর ধারে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। কাজ সেরে সে ঘুমাতে যাবার আয়োজন করছে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা-রাত। কিছুক্ষণ আগে কুয়াশায় ঢাকা ছিল সারা শহর। এখন আকাশ মেঘহীন সুন্দর। জোছনার আলোয় ভেসে যাচ্ছে শহরের রাস্তাঘাট। কাজের মেয়েটি জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁকে মোহিত করে তুলেছে। এমন সময় সে দেখতে পেল, একজন সৌম্য বয়স্ক পাকাচুলধারী ভদ্রলোক ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে আরেকজন খর্বাকৃতি ব্যক্তি। মেয়েটি দেখতে পেল, দুজনে এসে কাছাকাছি হচ্ছে একেবারে তার চোখের সামনে, জানালার নিচে। বুড়ো লোকটি খুব বিনীতভাবে মাথা নুইয়ে বেঁটে লোকটিকে কী যেন বলার চেষ্টা করল। তারপর হাত তুলে কী যেন বললেন। বোধহয় কোনো ঠিকানা জানতে চাইছেন তিনি।

মেয়েটি চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বুড়ো ভদ্রলোকটিকে সে চিনতে পারল না। কিন্তু অন্যজনকে দেখেই মেয়েটি চিনে ফেলল। ছোটখাটো লোকটির নাম হাইড। কারণ দিন কয়েক আগে হাইড তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। প্রথম দর্শনেই হাইডকে তাঁর খুব অপছন্দ হয়। লোকটির চেহারার মধ্যেই একটা হিংস্র আর বন্য ভাব ছড়িয়ে ছিল।

হাইডের হাতে রয়েছে একটা মোটা লাঠি। লাঠিটা সে বারবার ঘোরাচ্ছিল। বুড়ো লোকটির কথার কোনো জবাব না দিয়ে হিংস্র দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ তাকাল তার দিকে। তারপর হাইড হঠাৎ করে রেগে গেল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল তার। পাশবিক ক্রোধের লক্ষণ ফুটে উঠল তার চোখে। তারপর উন্মাদের মতো ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বুড়ো লোকটিকে আক্রমণ করে বসল।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। এই পরিস্থিতির জন্য কিছুতেই প্রস্তুত নন তিনি। সেই সময় মি. হাইড সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৃদ্ধের ওপর। লাঠির আঘাতে তাঁকে ফেলে দিলেন মাটিতে। পরমুহূর্তেই নখরযুক্ত বানরের মতো পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আঘাত করতে লাগলেন বুড়োকে। ঝড়ের গতিতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন তিনি। বৃদ্ধের কাতর চিৎকার ও হাড় ভাঙার মটমট শব্দও যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

কাজের মেয়েটি সেই নারকীয় দৃশ্য দেখে মুহূর্তেই মূর্ছা গেল। রাত প্রায় দুটোর দিকে মেয়েটির জ্ঞান ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছে।

খুনি পালিয়েছে অনেক আগেই। রাস্তার পাশে বুড়োর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ পড়ে আছে। খুনির মোটা লাঠিটার একটা ভাঙা অংশ পাশে। অনেক শক্ত, মোটা, মজবুত সেই লাঠিটা ভেঙে হয়ত দু-টুকরো হয়ে গেছে। বাকি অংশটা আশেপাশে কোথাও নেই। সম্ভবত খুনী সঙ্গে নিয়ে গেছে। পুলিশ মৃতব্যক্তির পকেট থেকে একটা টাকার ব্যাগ ও সোনার ঘড়ি পেল। আর পেল সিল করা ও স্ট্যাম্পমারা একটা খাম। সম্ভবত তিনি এটা পোস্ট করতে যাচ্ছিলেন। খামটার ওপরে বড় বড় করে লেখা আছে আইনজীবী আটারসনের নাম।

পরদিন ভোরে খামটা আইনজীবীর বাসায় নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি। ঘটনা শুনে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন। তারপর

বললেন, 'আমি লাশ শনাক্ত না-করার আগে পর্যন্ত কিছুই বলব না। ব্যাপারটা খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে।'

খুব দ্রুত তৈরি হয়ে নিলেন আটারসন। পোশাক-আশাক পরে রওনা দিলেন পুলিশ স্টেশনে। লাশটি সেখানেই এনে রাখা হয়েছে। লাশ দেখে তিনি সহজেই শনাক্ত করতে পারলেন।

'হ্যাঁ, এঁকে আমি ভালো করে চিনি। ইনি হচ্ছেন স্যার ড্যানভার্স কেরু।'

পুলিশ অফিসার আঁতকে উঠলেন,

'অ্যাঁ, বলেন কী? এও কি সম্ভব? উনি তো খুব সম্মানিত লোক। ওনার মৃত্যু নিয়ে তো দারুণ হইচই হবে।'

পুলিশ অফিসার তারপর সবিস্তারে সব বর্ণনা করলেন আটারসনকে। কাজের মহিলার কাছ থেকে যা যা শোনা হয়েছে সব বললেন। ভাঙা ছড়িখানাও দেখালেন। পুলিশের চোখমুখ তখন জ্বলজ্বল করছে। হত্যা রহস্যটিকে ঠিকমতো উন্মোচিত করতে পারলে তার পেশায় উন্নতিযোগ আছে।

আটারসন সব শুনলেন। হাইডের কথা শুনে একটু নড়েচড়ে উঠলেন। ভাঙা ছড়িটা দেখে সব সন্দেহের অবসান হল। এই ছড়িটা একসময় তিনিই ড. হেনরি জেকিলকে উপহার দিয়েছিলেন।

আটারসন জানতে চাইলেন, 'হাইড লোকটি কি একটু বেঁটে খাটো?'

পুলিশ জানালেন, 'যেমন বেঁটে তেমনই শয়তানের মতো দেখতে।'

আটারসন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে। আমি আপনাকে হাইডের বাড়িতে নিয়ে যাব।'

পুলিশ অফিসার রাজি। তখন সকাল নয়টা। লন্ডনের আকাশে কুয়াশার রং কাটেনি। ছাই ছাই রং ছড়িয়ে রয়েছে আকাশজুড়ে। আটারসনের ছোট্ট গাড়িটা রাস্তা ঘুরে ঘুরে চলেছে হাইডের বাড়ি অভিমুখে। কুয়াশার অস্পষ্টতা

কাটিয়ে তারা একসময় এসে পৌঁছাল সোহো স্ট্রিটে। শহর ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে। কাদামাটির পথ। অল্প কয়েকটা খুচরো দোকান, দেশি-বিদেশি লোকজনের আস্তানা। এখানেই হেনরি জেকিলের প্রিয় বন্ধুর আবাসস্থল—যে কিনা আড়াই লক্ষ পাউন্ডের উত্তরাধিকারী।

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল।

রুপালি চুলের এক শাদা বুড়ি এসে দরজা খুলে দিল।

'এটাই হাইড সাহেবের বাড়ি। কিন্তু তিনি তো এখন বাড়িতে নেই। গতরাতে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর এক ঘণ্টা পরেই আবার বেরিয়ে যান। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনিতেই তিনি খুব অনিয়মিত আসা-যাওয়া করেন। গত ছমাসে তাকে গতরাতেই কিছুক্ষণের জন্য শুধু দেখা গেছে।

আইনজীবী আটারসন বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আমরা তার ঘরটা একটু দেখব।'

বুড়ি একটু আমতা আমতা করতেই আটারসন জানালেন, 'ইনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ ইন্সপেক্টর নিউকোমেন।'

পুলিশের কথা শুনেই বুড়ির চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল কিছুটা খুশি খুশি ভাব।

'হ্যাঁ, তাই নাকি? সে কি কোনো সমস্যায় আছে? কী হয়েছে তার?'

বুড়ি যে খুব চালাক-চতুর এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না দুইজনের। বুড়ির সঙ্গে বোধহয় ভালো সম্পর্কও নেই হাইডের। বিশাল বাড়িতে মাত্র দুটো ঘর নিয়ে হাইড থাকেন। দুটো ঘরেই খুব দামি ও সৌখিন আসবাবপত্র রয়েছে। দামি কাঠের চেয়ার-টেবিল, রুপোর তৈজসপত্র, দামি একটা চিত্রকর্ম শোভা পাচ্ছে ঘরে। আটারসন ভাবলেন, ছবিটা নিশ্চয়ই হেনরি জেকিল কিনে উপহার দিয়েছেন। কারণ তিনি চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী। মেঝেতে বিছানো কার্পেটটাও খুব মূল্যবান ও কারুকার্যময়।

কিন্তু ঘরটা কেউ যেন এলোমেলো করে রেখে গেছে কিছুক্ষণ আগে। জামাকাপড়গুলো সব মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো। শার্টের পকেটগুলো উল্টোনো। ড্রয়ার টেনে বার করা হয়েছে। আর প্রচুর কাগজপত্র পোড়ানো হয়েছে। ছাই উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। ছাইয়ের গাদা থেকে ইন্সপেক্টর একটা অর্ধেক পোড়া চেকবই পেলেন। দরজার পাশে ভাঙা ছড়িখানার বাকি অর্ধেকটাও পেয়ে গেলেন তিনি।

ইন্সপেক্টর খুব খুশি হলেন। হত্যাকাণ্ডের মোটিভ তার হাতের মুঠোয়। ব্যাংকে খবর নিয়ে জানা গেল, সেখানে হাইডের নামে বেশ কয়েক হাজার পাউণ্ড জমা আছে।

আটারসনকে তিনি বললেন, 'খুনি এখন আমার হাতে। খুন করার পর সে নিশ্চয়ই উদভ্রান্ত হয়ে গেছে। নইলে ভাঙা ছড়িখানা এভাবে পড়ে থাকত না। অথবা চেকবই পোড়াত না। ভাইরে, টাকাইতো মানুষের জীবনের সব। এখন ব্যাংকে বসে খুনির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর খুনিকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য হ্যান্ডবিল ছাপতে হবে।

কিন্তু হ্যান্ডবিলে কী লেখা হবে সেটা বের করা খুব কঠিন হল। কারণ হাইডকে শনাক্ত করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। এমন কি তার বাড়ির কাজের লোকও তাকে দেখেছে মাত্র বারকয়েক। তার পরিবারের কোনো খোঁজ-খবর জানা নেই। তাঁর কোনো ছবিও নেই। তাঁকে যারা দেখেছে তাদের বর্ণনাও একেক জনের একেক রকম। শুধু একটি জায়গায় সকলে একমত—

অবর্ণনীয় দুঃসহ শারীরিক বিকৃতি রয়েছে লোকটার।

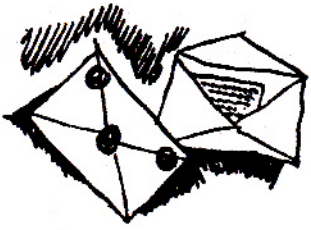

চিঠির ঘটনা

বিকেলের আলো যখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে সেই পড়ন্তবেলায় মি. আটারসন গেলেন ড. জেকিলের বাড়িতে।

পুল দরজা খুলে সাদর সম্ভাষণ জানাল তাঁকে। রান্নাঘর পেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে তাঁকে নিয়ে গেল বাগানের পাশে একটা দালানে। এটা বাড়ির পেছন দিক। এই দালানেই ড. জেকিলের ল্যাবরেটরি রুম। বিখ্যাত এক সার্জনের কাছ থেকে তিনি বাড়িটা কিনেছিলেন। সেই সার্জনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ও অপারেশনের যন্ত্রপাতি এখানেই রয়েছে। বাগানের শেষ প্রান্তে রুমটা। আইনজীবী আটারসন এই প্রথম বন্ধুর বাড়ির এই অংশে প্রবেশ করলেন। তিনি মন দিয়ে জানালাহীন, স্যাঁতসেঁতে বাড়িটাকে দেখলেন। ঘরের মধ্যে নিঝুম নীরবতা। টেবিল রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ভরা। ছড়ানো-ছিটানো অনেক বাক্স-প্যাঁটরা রয়েছে। সারা ঘরেই কুয়াশাচ্ছন্ন মৃদু আলোর উঁকিঝুঁকি। ঘরের শেষ প্রান্তে কয়েকধাপ সিঁড়ি। সেখানে একটা দরজা, দরজায় পুরু লাল পর্দা ঝুলছে। সেই দরজা পেরুতেই মি. আটারসন ডাক্তারের সাক্ষাৎ পেলেন। বিশাল বড় ঘর, চতুর্পাশে দামি কাচের কারুকার্য, ভারী আসবাবপত্র, বড় একটা টেবিল, ময়লা-জমা জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের কিছু দৃশ্য। সেই সরু রাস্তাটি। সেই রাস্তার পাশেই একটি দরজা। প্রায়ই বন্ধ থাকে। ঘরটাকে উষ্ণ করে রাখার জন্য চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। চিমনি ঢাকা একটা বাতিদানে নরম আলোর খেলা। তার পাশেই বসে আছেন ড. জেকিল। দেখে তাঁকে মারাত্মক অসুস্থ মনে হচ্ছে।

বন্ধুকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। বসে থেকেই ভাঙা কণ্ঠস্বর এবং শীতল হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

পুল বেরিয়ে যেতেই আটারসন বললেন, 'খবর নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ?'

ড. জেকিল ভীত হয়ে জানতে চাইলেন, 'ওরা রাস্তা থেকে চিৎকার করে এসবই বলাবলি করছিল। আমি ডাইনিংরুমে বসে সবই শুনেছি।'

আইনজীবী আটারসন বললেন, 'শোনো, আমার একটা কথা। কেরু আমার মক্কেল ছিল। তুমিও। আমি জানতে চাই এখন আমি কী করব?— হাইডকে লুকিয়ে রাখার মতো পাগল তুমি নিশ্চয়ই নও।'

'আটারসন, তুমি বিশ্বাস করো হাইডের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। তাকে আমি আর দেখতে চাই না। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমার কোনো সাহায্যও তার আর দরকার নেই। আমি তাকে যতটুকু জানি তুমি তার কিছুই জানো না। সে এখন নিরাপদ, সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার কথা আর কেউ কোনোদিন শুনবে না।'

মুখ ভার করে আইনজীবী সব শুনছিলেন। বন্ধুর পক্ষপাতমূলক কথা তার ভালো লাগছিল না। তিনি বললেন, 'তুমি তার ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিত মনে হচ্ছে। হয়ত তুমি ঠিকও। কিন্তু কেরু হত্যার বিচারের সময় তোমার নাম উঠতে পারে।'

ড. জেকিল জবাব দিলেন, 'আমি হাইডের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। এবং এর যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। আমি, আমি একটা চিঠি পেয়েছি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, চিঠিটা পুলিশকে দেখাব কি না! আমি চিঠিটা তোমাকে দেখাতে চাই আটারসন। জানি, সঠিকভাবে এর মর্মোদ্ধার তুমিই করতে পারবে। আমি তোমাকে প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করি।'

আটারসন বললেন, 'তোমার কি ধারণা এই চিঠি থেকেই তাকে ধরা যাবে।'

'না, হাইডের কী হবে আমি সে কথা ভাবছি না। তার কথা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন নিজেকে নিয়েই চিন্তিত। এই ঘৃণ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার চরিত্র নিয়ে না-জানি কী টানা-হ্যাঁচড়া হয়।'

বন্ধুর স্বার্থপরতার কথা শুনে আটারসন কিছুটা অবাক হলেন। স্বস্তিও পেলেন খানিকটা।

শেষে তিনি বললেন, 'চিঠিটা আমাকে দেখতে দাও।'

বেখাপ্পা, খাড়া খাড়া হস্তাক্ষরে চিঠিটা লেখা। নিচে স্বাক্ষর দেয়া আছে— এডওয়ার্ড হাইড। চিঠিটি লেখা হয়েছে উপকারী পৃষ্ঠপোষক ড. জেকিলকে। যার অবদান তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। কিন্তু এখন থেকে তার নিরাপত্তার জন্য ড. জেকিলকে আর কষ্টস্বীকার করতে হবে না। কারণ নিজের নিরাপত্তার উপায় এখন থেকে তিনি নিজেই খুঁজে বার করবেন।

চিঠিটা পড়ে আইনজীবী আটারসনের ভালোই লাগল। মনের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠা কিছু সন্দেহ যে অমূলক ছিল—এই ভেবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'চিঠির খামটা কই?'

'খামটা তো নেই। ওটা আমি বেখেয়ালে পুড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু ওতে কোনো ডাক-অফিসের সিল ছিল না। চিঠিটা কেউ হাতে হাতে দিয়ে গেছে।'

'ও আচ্ছা! চিঠিটা কি আমার কাছে রাখতে পারি।'

'নিশ্চয়ই। আমার হয়েই তুমি বিচার-বিবেচনা করো। আমি নিজের ওপর ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলছি আটারসন।'

'ঠিক আছে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তবে একটা কথা। উইলে যেসব শর্তের উল্লেখ আছে হাইড কি জোর করে তোমাকে দিয়ে সে সব লিখিয়েছে।'

ডাক্তারের চেহারায় একটা মলিন ভাব ছড়িয়ে পড়ল। যেন এক্ষুনি তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাবে। কোনোমতে মুখ নাড়িয়ে তিনি সায় দিলেন।

আটারসন বললেন, 'আমি জানতাম। সে তোমাকে খুন করত। তুমি বড় বাঁচা বেঁচে গেছো।'

ডাক্তার ভাঙা কণ্ঠস্বরে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুধু বেঁচে যাওয়া নয়, আরও অনেক কিছু। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। ওহ্ ঈশ্বর, চরম শিক্ষা পেয়েছি আমি।'

দুহাতে মুখ ঢেকে একেবারে ভেঙে পড়লেন ড. জেকিল।

ফেরার পথে আটারসনের দেখা হল বহুদিনের পুরনো কাজের লোক পুলের সঙ্গে। এ-কথা সে-কথার ফাঁকে পুলকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকে হাতে হাতে একটা চিঠি এসেছে। পত্রবাহক দেখতে কেমন ছিল বলতে পার?'

পুল জানাল, 'এমন কোনো পত্রবাহক আজ আসে নি। সমস্ত চিঠিই ডাকে এসেছে।

এই খবরে নতুন করে একটু ভীত হয়ে পড়লেন আটারসন। চিঠিটা নিশ্চয়ই তবে ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে কেউ দিয়েছে। অর্থাৎ হাইড যত সহজ কথাই চিঠিতে লিখুক না কেন, ব্যাপারটি তত সহজ নয়। অতএব অন্যভাবে বিচার করতে হবে এবং খুব সতর্কভাবে কাজে অগ্রসর হতে হবে।

পথে যেতে যেতে আটারসন শুনতে পেলেন, হকাররা চিৎকার চেঁচামেচি করে বলছে, 'খবর। খবর। বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে।

মারাত্মক মৃত্যু সংবাদ। পার্লামেন্টের সদস্য খুন।'

আটারসন ভাবলেন, ঘটনাটা কোথায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় কে জানে। কেরু তার মক্কেল, জেকিল তার বন্ধু। বন্ধু কোনো স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়ুক এ তিনি চান না। আর তাই একরকম সেধেই তিনি এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন। ঘটনার জট খোলার ব্যাপারে এখন তিনি উন্মুখ।

বাড়ি ফিরে আটারসন নিজের ঘরে বসেছিলেন। তার সামনে বসে আছেন তার হেড ক্লার্ক মি. গেস্ট। চুল্লির আগুনের উষ্ণতায় আটারসন আরামবোধ করছেন। লন্ডনে এখন দারুণ শীত। বাইরে কুয়াশা ঝরছে। আকাশে জমাটবাঁধা মেঘ। দুরন্ত বাতাস মাঝে-মধ্যে আঘাত হেনে যাচ্ছে জানালায়।

ঘরের মধ্যে আগুনের লালচে আভা। জানালার শার্শিতে সে আভা ছড়িয়ে পড়ছে। মি. আটারসন একমাত্র মি. গেস্টকেই যে কোনো গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। গেস্ট অনেকবারই নানা কাজের সূত্রে ডাক্তার জেকিলের বাড়িতে গিয়েছেন। পুলকেও তিনি চেনেন। সে বাড়ির সঙ্গে হাইডের ঘনিষ্ঠতার খবর সম্পর্কেও তিনি হয়ত ওয়াকিফহাল। হয়ত তাঁকে চিঠিটা দেখালে এই রহস্যের কোনো জট উন্মোচিত হতে পারে। গেস্ট নিজেও একজন হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ। হাতের লেখা দেখে সে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে দিতে পারে। হাতের লেখা দেখে কিংবা চিঠিটার বিষয়বস্তু পড়ে গেস্ট নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো মন্তব্য করবেন। এর থেকে হয়ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে নেয়া যেতে পারে।

আটারসন বললেন, 'স্যার ড্যানভার্স কেরুর মৃত্যুসংবাদটি খুবই করুণ। মর্মান্তিক। দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, স্যার। জনমনেও ব্যাপারটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে তাকে হত্যা করেছে সে নিশ্চয়ই পাগল ছিল।'

'এ বিষয়ে আমি তোমার মতামত জানতে চাই। আমার কাছে খুনির হাতের লেখা একটা চিঠি আছে। সেটা আমি তোমাকে দেখাতে চাই। অবশ্য

এ-কথা কাউকে বোলো না। কারণ আমি নিজেই জানি না আমি কী করব। তবে তুমি এটাকে খুনির ছোট্ট একটা ক্লু হিসাবে ধরতে পার।'

কথা শুনে গেস্টের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল চিঠিটার ওপর এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর বলল, 'না স্যার, খুনি পাগল নয়। তবে তার হাতের লেখাটা একটু অন্যধরনের।'

'লেখাটা যে অন্যধরনের এ ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো দ্বিমত নেই।' টিপ্পনী কাটলেন আইনজীবী।

ঠিক সেই মুহূর্তে, কাজের ছেলেটা একটা চিরকুট নিয়ে প্রবেশ করল। চিরকুটটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন আটারসন। গেস্ট হাতের লেখার ধাঁচটা দূর থেকে দেখেই বললেন, 'ওটা কি ড. জেকিলের চিঠি স্যার? হাতের লেখাটা কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে। ব্যক্তিগত জরুরি কোনো কিছু কি লিখেছেন উনি?'

'না, না তেমন কিছু নয়। ডিনারের আমন্ত্রণ। কেন, চিঠিটা কি তুমি দেখতে চাও?'

হেডক্লার্ক গেস্ট চিরকুটটা হাতে নিলেন। দুটো হাতের লেখাই তিনি তারপর গভীর মনোনিবেশ দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন। কিছুক্ষণ পরে দুটো চিঠিই আটারসনের হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'ভারি আশ্চর্য হাতের লেখা।'

একটু থেমে আটারসন ধীরস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুটোর মধ্যে মিলিয়ে তুমি কী পেলে গেস্ট?'

'দুটো লেখার মধ্যেই আশ্চর্যরকমের মিল রয়েছে, স্যার। দুটো হাতের লেখাই প্রায় একইরকম। একটা খাড়া খাড়া। অন্যটা ঈষৎ হেলানো।'

'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই! আপনিও মিলিয়ে দেখলে সেটা বুঝতে পারবেন।'

'এই চিঠির কথা কিন্তু কাউকে বলা উচিত হবে না, বুঝলে?'

'না, স্যার। সেটা বুঝতে পেরেছি।'

মি. গেস্ট চলে যাবার পরে রাত্রে আটারসন অনেক কিছু ভাবলেন। যত্ন করে চিঠিটা সিন্দুকে ভরে রাখলেন। যথাসময়ে চিঠিটা খুব কাজে লাগতে পারে। আটারসন ভাবতে লাগলেন—অবাক ব্যাপার! ডক্টর জেকিল কি তবে একজন খুনির লেখা জাল করে ফাঁকি দিতে চাইল।

তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত সমস্ত রক্ত যেন শীতল হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু রহস্যের কোনো কূল-কিনারা পাওয়া গেল না।

ডক্টর ল্যানিয়ন

দিন কেটে যায়।

পুলিশ স্যার ড্যানভার্স কেরুর হত্যাকারীকে গ্রেফতারের জন্য হাজার হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করল। কিন্তু হাইডের কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। কেউই তার সন্ধান দিতে পারল না। যেন তাঁর অস্তিত্বই কোনো কালে ছিল না। পুলিশি সন্ধানের ফলে হাইডের অনেক নিষ্ঠুর কার্যকলাপের কাহিনী উন্মোচিত হল। তার অতীতের নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও নানাবিধ দুষ্কর্মের ঘটনা প্রকাশিত হল। কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থিতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা গেল না। ঘটনার দিন সোহো স্ট্রিটের বাসা থেকে সেই যে লাপাত্তা হয়েছেন মি. হাইড তার আর কোনো খবরই জানা যায় নি।

যে কোনো উত্তেজিত ঘটনাই একসময় স্তিমিত হয়ে আসে। স্যার কেরুর হত্যাকাণ্ডে খুব ভেঙে পড়েছিলেন আটারসন। কিন্তু হাইডের অন্তর্ধানে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে কোনো অগ্রগতি হল না। ড. জেকিল হাইডের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আগের মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে গেলেন। আগের মতোই তিনি সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটা আবার চাঙা হয়ে উঠল। তাঁর চোখে মুখে রোগাক্রান্ত নৈরাশ্যের ভাব মুছে গিয়ে পুরনো উজ্জ্বল দ্যুতি ফিরে এল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে বাড়িতে নিয়মিত নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বুক থেকে যেন তাঁর বড় একটা পাথর নেমে গেছে। অনেকদিন বাদে তিনিও বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করলেন। বহুদিন পর যেন তিনি মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন।

কাজে কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কেটে গেল দীর্ঘ দুটি মাস।

৮ জানুয়ারি আটারসন জেকিলের বাড়িতে ছোটখাটো একটি পার্টিতে অংশ নিলেন। ড. ল্যানিয়নও ছিলেন সেখানে। প্রত্যেকের আচার আচরণেই যেন ফিরে এল পুরনো সেই দিনের কথা। পুরনো তিন বন্ধুর যেন পুনর্মিলনী উৎসব হল। কিন্তু দুদিন বাদেই সবকিছু বদলে গেল। পর পর দুদিন—১২ এবং ১৪ জানুয়ারি আটারসন গেলেন ড. জেকিলের বাসায়। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয় না তাঁকে। মাত্র কয়েকদিন আগে আনন্দের যে বন্যা ডেকেছিল তা যেন নিমেষেই উবে গেল। ল্যাবরেটরি রুমের দরজা বন্ধ। পুল জানাল, ড. ঘরের মধ্যে একা আছেন। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গেই দেখা করবেন না।'

জেকিল বন্ধ ঘরে একা বসেছিলেন। আটারসনের অনুরোধেও দরজা খুললেন না। আটারসনের কিঞ্চিৎ রাগ হল। তার চেয়ে তিনি বিস্মিত হলেন বেশি। পরদিন তিনি আবার গেলেন। একই জবাব পেয়ে আশাহত হতে হল তাঁকে। গত দুমাস ধরে প্রায় নিয়মিত তিনি এ বাড়িতে এসেছেন। এই পরিবর্তনের কোনো কারণ তিনি বুঝতে পারলেন না। বুকের মধ্যে যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসল তাঁর।

দিন ছয়েক পরে তিনি ড. ল্যানিয়নের বাড়িতে গেলেন। পুরনো বন্ধুর কাছে কোনো খবর পাওয়া যায় কি না দেখা যাক। তাঁর বাড়িতে প্রবেশাধিকারে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ল্যানিয়নের দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখে তিনি বড়ই অবাক হলেন। রক্তহীন, ফ্যাকাশে মুখ। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণের কালো ছাপ চেহারায়। কেউ যেন তাঁর নামে মৃত্যু-পরোয়ানা লিখে গেছে—এরকমই আসন্ন মৃত্যুর চিহ্ন চোখে-মুখে। উজ্জ্বল মানুষটি নেতিয়ে পড়েছেন। চামড়া ঝুলে পড়েছে। তিনি যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন। শুধু শরীরেই পরিবর্তন ঘটে নি—মানসিকভাবেও তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চোখে-মুখে যেন তার বিভীষিকার ছায়া। আটারসন ভাবলেন—একেই কি মৃত্যুভয় বলে। ল্যানিয়ন নিজে একজন ডাক্তার। হয়ত বুঝতে পেরেছেন, মৃত্যু তার নিকটবর্তী। তাই কি ভেঙে পড়েছেন করুণ হতাশায়?

আটারসন উদ্বেগাকুল হয়ে জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার ভাই, কী হয়েছে?'

গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল ল্যানিয়নের কণ্ঠস্বর।

'জীবনে একটা দারুণ আঘাত পেয়েছি। এই ধাক্কা আমি আর সামলে উঠতে পরব না। এখন শুধু দিন গণনার পালা। হয়ত সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি শেষ হয়ে যাব।'

কথা বলতে বলতে ল্যানিয়নের মুখের আদল বদলে গেল। আটারসন বললেন, 'ড. জেকিলও অসুস্থ। তার সঙ্গে কি এর মধ্যে তোমার কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?'

উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপতে লাগল ল্যানিয়নের। একটা শীর্ণ কম্পিত হাত তুলে তিনি বললেন, 'আমার সামনে আর জেকিলের নাম উচ্চারণ কর না। আমি তার কথা শুনতে চাই না।'

তারপর টেনে টেনে ধীরস্বরে তিনি বললেন, 'আমার চোখে জেকিল এখন মৃত। ওর কথা দয়া করে আমাকে বল না।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু আমি কি তোমাকে কোনোই সাহায্য করতে পারি না। আমরা তিনজনই বহুদিনের পুরনো বন্ধু। নতুন করে বন্ধু তৈরি করার বয়সও আমাদের নেই।'

'কিন্তু আর কিছুই করার নেই। তারচেয়ে বরং জেকিলকেই জিজ্ঞেস কর।'

ল্যানিয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে জবাব দিল।

'সে তো আমার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না।'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আটারসন, আমার মৃত্যুর পর হয়ত তুমি সব জানতে পারবে। আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না—কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আমার পাশে বসে তুমি অন্য কথা বল। ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করো না। আমি জেকিলের প্রসঙ্গ সহ্য করতে পারি না।'

সে রাত্রে বাড়িতে ফিরেই আটারসন ড. জেকিলকে অভিযোগ করে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তার প্রতি ল্যানিয়নের তীব্র ঘৃণা ও রাগের কথা উল্লেখ করলেন। কেন সে বন্ধ ঘরে নিজেকে অমন করে আটকে রেখেছে? কেনইবা সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী নয়? চিঠিতে সবিস্তারে এসব জানতে চাইলেন আটারসন।

পরদিন সে চিঠির জবাব এল। খুবই মর্মন্তুদ ও করুণ ভাষায় লেখা দীর্ঘ একটি চিঠি। মাঝে মাঝে রহস্যময় কিছু বাক্য যার অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

> 'ল্যানিয়নের সঙ্গে বিচ্ছেদের কোনো মীমাংসা আর সম্ভব নয়। আমি আমার পুরনো বন্ধুকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। তার কোনো অপরাধ নেই। তাঁর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকে গেছে। তার সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই আশাব্যঞ্জক। এখন থেকে আমি নীরবে নিভৃতে একাকী জীবনযাপন করতে চাই। এতে তুমি বিস্মিত হয়ো না। তোমার জন্য যদি আমার দরজা বন্ধও থাকে তবু তুমি আমার বন্ধুত্বে অবিশ্বাস করো না। আমার অন্ধকার পথে তুমি আমাকে একাকী চলতে দাও। আমি নিজের ওপর ভয়ানক শাস্তি ও বিপদ ডেকে এনেছি। আমার পাপের কোনো শেষ নেই। এই পাপের

শাস্তি আমাকেই বহন করতে হবে। এই পৃথিবীতেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাকে। হয়তো এটাই আমার ললাট লিখন। আটারসন, আমার একাকিত্বে বাধা সৃষ্টি না করে তুমি আমার পাপের বোঝা কিছুটা কমাতে পার।...

চিঠি পড়ে আটারসন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। হাইডের বীভৎস প্রভাব কেটে যাবার পর জেকিল সুস্থ স্বাভাবিক পুরনো দিনগুলো ফিরে পেয়েছিলেন। সপ্তাহখানেক আগেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছিলেন। আনন্দ উচ্ছল, হাসিখুশি, সম্মানিত মানুষের মতোই জীবনযাপন শুরু করেছিলেন। হঠাৎ কী এমন ঘটে গেল যে, বন্ধুবান্ধব, আরাম-আয়েশ সব পরিত্যাগ করে জীবনের প্রতি অসীম নৈরাশ্য নিয়ে একা হয়ে পড়লেন। এত দ্রুত পরিবর্তন তো মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। ল্যানিয়নের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে সন্দেহ হচ্ছে—ব্যাপারটি খুব সাধারণ নয়। এর মধ্যে গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ল্যানিয়ন বিছানায় শায়িত হয়ে পড়লেন। পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। মৃতদেহ সৎকার করে ঘরে ফিরে এলেন আটারসন। মনটা আজ তার বিষণ্ন, কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ করতে লাগলেন। অফিস রুমে এসে ড্রয়ার টেনে তিনি একটা লম্বা খাম বের করলেন। যথারীতি খামটা সিলমোহর করা। খামের ওপরে লেখা—একান্ত গোপনীয়। শুধু আটারসনের জন্য। আমার মৃত্যুর পরই এই খাম খোলা যাবে। যদি আগে আটারসনের মৃত্যু হয় তবে খামটি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এই লেখা পড়ে আইনজীবী আটারসন খুব চিন্তিত হলেন। এক বন্ধুকে আজ মাটির নিচে রেখে এসেছি, আরেক বন্ধুকেও কি আজ হারাতে হবে?

ভয় কাটিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে আটারসন খামটি খুললেন। ভেতরে সিল করা আরেকটি চিঠি। ওপরে লেখা—ড. জেকিলের মৃত্যু অথবা অন্তর্ধানের পরেই যেন খামটা খোলা হয়।

আটারসন নিজেই যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আবার সেই অন্তর্ধানের কথা! জেকিলকে ফেরত দেয়া উইলের মধ্যেও লেখা ছিল অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ। উইলে অন্তর্ধানের রহস্যটা একেবারে পরিষ্কার। হাইড হয়ত সে উইলটি জোর করে লিখিয়েছিল। সেটা তো ছিল হাইডের একটা কুৎসিত চক্রান্ত। কিন্তু ল্যানিয়ন অন্তর্ধানের কথা লিখলেন কেন? অন্তর্ধান বলতে তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এক প্রবল কৌতূহল তাড়া করতে লাগল আটারসনকে। খামের ভেতর কী লেখা আছে তা জানার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু পেশার প্রতি তিনি সৎ এবং মৃত বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য অদম্য কৌতূহলকে তিনি দমন করলেন। খামটা সিন্দুকের গোপনতম স্থানে আবার যত্ন করে রেখে দিলেন।

কৌতূহলকে দাবিয়ে রাখা এক কথা। তাঁকে জয় করা আরেক কথা। সেদিন থেকে জেকিলের ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন আটারসন। হয়ত তিনি জেকিলের আচরণে ভয়ানক আহত বোধ করেছেন কিংবা ব্যাপারটি বিভীষিকার চোখে দেখেছেন। জেকিলের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য বাসায় যেতেন তিনি। কিন্তু আগের মতোই ফিরে আসতে হত তাঁকে। পুলের কাছ থেকে মাঝে মাঝে খবর পেতেন। আশাপ্রদ খবর নয় সেসব। ডক্টর দিনে দিনে আরও যেন রহস্যময় হয়ে উঠছেন। আরও একাকী, নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন তিনি। ল্যাবরেটরির সেই ভ্যাপসা ঘরটিতেই তিনি থাকেন। সেখানেই তিনি ঘুমান, খাওয়া-দাওয়া করেন। কোনো কিছুতেই তার উৎসাহ নেই, আরও নীরব হয়ে গেছেন। কিছু পড়েনও না। কী যে তিনি করছেন, তা নিজেও জানেন না।

আটারসন জেকিলের উদ্ভট আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সংবাদ শুনে একটুও বিচলিত হন না।

ধীরে ধীরে আটারসন জেকিলের বাড়ি যাওয়া-আসা কমিয়ে দিলেন।

জানালার ধারে

কোনো এক রবিবার।

আটারসন তাঁর দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে এনফিল্ড। বেড়াতে বেড়াতে তারা সেই গলির মুখে দাঁড়ালেন। সামনে এক দরজাঅলা, জানালাবিহীন সেই রহস্যময়, অদ্ভুত বাড়িটা। বাড়িটার সামনে এসে কিছুক্ষণের জন্য মৌন হয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

এনফিল্ড বললেন, যাক শেষ পর্যন্ত বাঁচা গেছে। হাইডের জন্য আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।

আটারসন জবাব দিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। হয়ত সে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। জানো হয়ত, একদিন আমিও দেখা পেয়েছিলাম হাইডের। দেখে তোমার মতোই, তার সম্পর্কে আমার কোনো ভালো ধারণা জন্মায় নি। লোকটা কেমন যেন ভয়ঙ্কর, বীভৎস তার চেহারা।'

'ওকে দেখলে সকলেরই একই ধারণা হবে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে এনফিল্ড বললেন, 'জানেন, আমি কী রকম গাধা, এই বাড়িটা যে জেকিলেরই বাড়ির পেছনের অংশ কিছুদিন আগে মাত্র সেটা জানতে পেরেছি।'

'জেনেছ যখন ভালোই করেছ। চল তাহলে, ভেতরে ঢুকি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দেখা যায় কি না কিছু! সত্যি বলছি, দুর্ভাগা জেকিলের জন্য আমিও উদ্বিগ্ন। আমার মনে হয়, বন্ধুবান্ধবদের মুখ দেখলে বেচারা কিছুটা ভালো বোধ করবে।

বাড়ির প্রাঙ্গণটা ভেজা, স্যাঁতসেঁতে। বাইরে তখনো অস্তমান সূর্যের শেষ আলোক-মালা মিলিয়ে যায় নি কিন্তু ভেতরে এরি মধ্যে ম্লান অন্ধকার। তিনটে জানালার মধ্যে মধ্যেরটা একটু খোলা। আটারসন সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটু মুক্ত আলোর প্রত্যাশায় অপরিসীম বিষণ্ন বদনে, বন্দি কয়েদীর মতো ড. জেকিল জানালার পাশে বসে আছেন।

আটারসন নিচ থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন,

'এই যে জেকিল কেমন আছ এখন? ভালো তো?'

ডক্টর ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমার দুর্বলতা এখনো কমেনি। আমি ভালো নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হয়তো শিগগিরই সব চুকেবুকে যাবে।'

'বাড়ির মধ্যে এমন সারাদিন চুপচাপ বসে থাক কেন? বাইরে বেরুতে পার না। এনফিল্ড বা আমার মতো একটু হাঁটাচলা না-করলে শরীর সুস্থ থাকবে কী করে? এস, হ্যাটটা মাথায় চড়িয়ে শিগগির নেমে এস। আমাদের সঙ্গে একটু হাঁটাচলা করলে ভালো লাগবে তোমার।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ বন্ধু। হাঁটতে আমিও খুব পছন্দ করি। কিন্তু না, না, সেটা আর সম্ভব নয়। সে সাহসও আমার নেই। আটারসন, তোমাদের দেখে খুবই খুশি হয়েছি আমি। তোমাকে এবং এনফিল্ডকে আমি ভেতরে আসতে বলতাম, কিন্তু জায়গাটা তোমাদের জন্য উপযুক্ত নয়।'

'তাতে কী হয়েছে? আমরা বরং এখান থেকেই তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

'আমিও সেটাই অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম।'

ডক্টরের মুখে প্রাণবন্ত হাসির রেখা কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই তাঁর মুখ থেকে হাসির রেশটুকু মিলিয়ে গেল। প্রচণ্ড ভীতি ও গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মুখমণ্ডল। এক পলকের জন্য আটারসন ডক্টরের ভয়াল, করুণ মুখখানা দেখতে পেলেন। তারপরেই সশব্দে জানালাটি বন্ধ হয়ে গেল।

সবকিছু দেখে আটারসন ও এনফিল্ডের বুকের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। দুজনে নীরবে সেখান থেকে ফিরে এলেন। দুজনকেই অত্যন্ত মলিন ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। রাস্তা ধরে কিছু দূর হাঁটার পরে আটারসন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন।

দুজনের চোখেমুখেই আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। এনফিল্ড নীরবে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন।

তারপর দুজনেই বাড়িমুখো রওনা দিলেন, নতমুখে, মৌন, মুখে কোনো কথা নেই।

শেষ রাত্রি

একদিন রাত্রে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আটারসন চুল্লির কিনারে এসে বসেছেন। শরীরটাকে একটু উষ্ণ করে নেবেন।

এমন সময় অযাচিতভাবে পুল এসে হাজির।

'কী ব্যাপার পুল? এত রাতে তুমি?'

পুলের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়েই আটারসন বললেন, 'তোমাকে অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? ডক্টরের কিছু হয়েছে কি?'

পুল বলল,

'কী আর বলব? খুব গোলমেলে ব্যাপার চলছে সব?'

'বস এখানে।'

আটারসন তাঁকে বসার চেয়ার দিলেন।

'আস্তে ধীরে খোলাখুলি সব বল তো'—ব্যাপারটি কী ঘটেছে?'

'ডক্টরের হালচাল তো কমবেশি আপনার জানাই আছে। নিজেকেই কেমন যেন বন্দি করে রেখেছেন। নির্বাসিত মানুষ এখন তিনি। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। এসব আমার আর ভালো লাগছে না। এখন আমি খুবই ভয় পাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন তোমার ভয় লাগছে। এর কারণ কী? পরিষ্কার করে বল সব।'

'গত এক সপ্তাহ ধরে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। মনের মধ্যে ভয় নিয়ে এইভাবে দিন কাটানো আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

আটারসন খেয়াল করে দেখলেন, পুলের চেহারার মধ্যেই ভয় ও শঙ্কার ভাব ফুটে উঠেছে। সে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। সে আবারও বলল, আতঙ্কগ্রস্ত সুরে, 'আমি আর পারছি না।'

'দেখো পুল, এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য তুমি এত ভয় পেয়েছ। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সেটা কী, খুলে বল আমাকে।'

'কী আর বলব? আমার মনে হয়, কিছু একটা শয়তানি চলছে—উল্টোপাল্টা ব্যাপার-স্যাপার—'

'কী সেই ব্যাপার—'

'সেটা বলার মতো সাহস বা শক্তি আমার নেই।'

কাঁপতে কাঁপতে পুল বলল, তারচেয়ে বরং আমার সঙ্গে চলুন। ব্যাপারটা নিজের চোখেই দেখবেন।'

আটারসন আর দেরি করলেন না। দ্বিধাহীন চিত্তে দ্রুত তিনি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। মাথায় হ্যাট এবং পরনে লম্বা কোট। ক্ষিপ্র পায়ে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

লন্ডনের মার্চ মাসের হাড়-কাঁপানো রাত্রি। ঠাণ্ডা বুনো বাতাস ঝাপটা মেরে যাচ্ছে মুখে চোখে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে পাশের জনের সঙ্গেও কথা বলা যায় না। কুয়াশা-মলিন রাতের আকাশে নিষ্প্রভ একাদশীর ম্লান চাঁদ। রাস্তাঘাট নীরব, নির্জন। এরকম পরিবেশে অজানা বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আটারসনের মন। মোহাচ্ছন্নের মতো দ্রুত বেগে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

জেকিলের বাড়ির কাছাকাছি এসে যখন পৌঁছেছেন তখন বাতাস আরও দ্রুত বইতে শুরু করেছে। যেন শুরু হয়েছে ঝড়। বাগানের সরু সরু গাছগুলো বাতাসের ঝাপটায় ঘন ঘন দুলছে, আছড়ে পড়ছে দেয়ালের ওপর।

পুল সারাটা পথ নীরব, আগে আগে পথ দেখিয়ে হাঁটছিল সে। এমন শীতের রাতেও কপালে তাঁর ঘামের বিন্দু। ভয়ে বিবর্ণ ও সাদাটে হয়ে আছে চেহারা। বেচারা গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার ফলে পুল খুবই ক্লান্ত।

বাড়ির সামনে এসে দরজায় হালকা কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আরেক ভৃত্যের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি পুল। দরজা খোল।'

ভেতরে ঢুকতেই আটারসন দেখলেন, উজ্জ্বল আলোকিত হলঘরটিতে দারুণ উষ্ণতা।

জ্বলন্ত চুল্লিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চুল্লির সামনে বাড়ির গৃহভৃত্য ও ঝি-চাকরেরা জড়ো হয়েছে। সকলের চোখে-মুখেই ভয় ও চিন্তার কালো ছায়া। সকলেই আতঙ্কিত।

আটারসনকে দেখেই কেউ কেউ কেঁদে উঠল। কেউ যেন সাময়িক সান্ত্বনা খুঁজে পেল। কেউ যেন জড়িয়ে ধরতে চাইল আটারসনকে। তিনি জানতে চাইলেন,

'কী ব্যাপার? তোমরা সবাই একখানে বসে আছ কেন? কাজ নেই তোমাদের? বাড়ির কর্তা জানতে পারলে কিন্তু রাগ করবেন?'

পুল বলল,

'ওরা সবাই খুবই ভয় পেয়েছে স্যার।'

সবাই চুপ করে বসে রইল। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। শুধু কাজের মেয়েটা প্রথমে মৃদু সুরে পরে ফুঁপিয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠল।

পুল তাঁকে জোরে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। ধমকের সুরে বোঝা গেল পুল এখনো সুস্থির হয় নি। সেও বিকারগ্রস্ত। তারপর একটা ছেলেকে ডেকে পুল বলল, 'যা, শিগগির একটা মোমবাতি নিয়ে আয়।'

মোমবাতি হাতে নিয়ে পুল আটারসনকে বলল, 'এবারে আমার সঙ্গে ধীরে ধীরে আসুন। কোনো শব্দ করবেন না। শুধু শুনে যাবেন। আর সব দেখে যান। যদি আমার মনিব আপনাকে ভেতরে ডাকে, খবরদার, যাবেন না কিন্তু।'

এই বলে সে বাড়ির পেছনে ল্যাবরেটরি রুমের দিকে চলল। সমস্ত পরিবেশটাই আটারসনের মনের ওপর গভীর আতঙ্কের ছাপ এঁকে দিল। হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলেন তিনি। তারপরই মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে নিলেন। ধীরে ধীরে পুলকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন। অবশেষে তারা ল্যাবরেটরি রুমের সামনে শিশি বোতল বাক্সের বিশাল স্তূপ পেরিয়ে সিঁড়ির দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হলেন। পুল ইঙ্গিত করলেন, যেন কোনো শব্দ না হয়। নিজে অনেক সাহসে, মরিয়া হয়ে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উপরে উঠল পুল। পর্দার ওপর দিয়ে ভারী দরজায় কাঁপা কাঁপা হাতে

মৃদু আঘাত করে ভীতকণ্ঠে সে বলল, 'স্যার, আটারসন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ভেতর থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তাকে বলে দাও, আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

বলেই পুল রান্নাঘর, উঠোন পেরিয়ে ফিরে এল সেই হলঘরে। ভয়ার্ত ভৃত্যেরা সেখানে জটলা করছে। আটারসনের চোখের দিকে তাকিয়ে পুল বলল, 'স্যার, গলার স্বর শুনে কী বুঝলেন? এই কি আমার মনিবের কণ্ঠস্বর?'

আটারসন নমনীয় কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'না হে, গলাটা যেন খুব বদলে গেছে।'

ঠিকই বলেছেন স্যার? গত বিশ বছর ধরে আমি এই বাড়িতে আছি। আমি তার কণ্ঠস্বর চিনব না? এ আমার মনিবের গলা নয়। আমার মনিব আর নেই। আট দিন আগে, ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমার মনিব কান্নাকাটি করতে শুরু করেন। শেষবারের মতো তখনই তার গলার স্বর শুনতে পেয়েছি। এখন ভেতরে যে বসে আছে, কে সে জানি না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আছে তাও জানা নেই।'

আটারসন বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন।

'খুবই অবাক ব্যাপার। এসব কী বলছ তুমি? তোমার কথাই যদি সত্যি হয় তবে জেকিলকে কেউ খুন করেছে। কিন্তু সেটাও যদি হয় তবে খুনি এখনো ঘরের মধ্যে কেন? আট দিন পরেও সে ভেগে যাবে না—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি ভুল ধারণা করছ।'

'হ্যাঁ, স্যার, আপনাকে বিশ্বাস করানো শক্ত। আপনি এখন অবিশ্বাস করছেন। কিন্তু সব খুলে বললে আপনি বিশ্বাস না করে পারবেন না। গত সাত দিন ধরে বদ্ধঘরে বসে আমার মনিব কিংবা সে যেই হোক সারাক্ষণ শুধু একটা ওষুধের জন্য চিৎকার করছে। অনবরত কাগজে ওষুধের নাম লিখে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে নিচে। আমরা দিনে তিনবার করে বাইরে খাবার রেখে দিচ্ছি। কিন্তু সে আমাদের সামনে আসতে নারাজ। সকলের অজান্তে কোনো এক সময় খাবার নিয়ে যায় ভেতরে। কিন্তু ভেতর থেকে কাগজের টুকরো ছাড়া সে আর কিছুই ফেলে না। ওষুধটি নাকি তার খুবই প্রয়োজন। গত তিন দিন ধরে আমি কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে শহরের যাবতীয় ওষুধের দোকানে দোকানে ঘুরছি। কিন্তু যতবারই ওষুধ এনেছি তার সবই নাকি ভেজাল। আবার নতুন করে ওষুধ আনার জন্য ছুটতে হয়েছে আমাকে। যেমন করেই হোক ওষুধটা তার চাই-ই চাই।'

আটারসন জানতে চাইলেন, 'তোমার কাছে কাগজের টুকরোগুলো আছে নাকি?'

পুল পকেট হাতড়ে দলা পাকানো এক টুকরো কাগজ বের করে আটারসনের হাতে দিল। তিনি আলোর নিচে নিয়ে তা পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে :

মেসার্স ম্য, আপনারা ড. জেকিলের শুভেচ্ছা জানবেন। দুঃখের বিষয়, আপনারা শেষ বার আমাকে যে ওষুধ পাঠিয়েছেন সেটা ভেজাল এবং ভেজালের কারণেই সেটা ব্যবহারের অনুপযুক্ত। ১৮...সালে আমি একবার প্রচুর পরিমাণে ঐ ওষুধ কিনেছিলাম। পুরনো স্টকে খোঁজ করলে হয়ত পাওয়াও যাবে। তার কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তাই পাঠিয়ে দিন। দামের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। ওষুধটি আমার খুবই প্রয়োজন। এর জন্য আমি যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত।

তারপরই পত্রলেখক যেন আবেগে ভেঙে পড়েছেন। ঈশ্বরের দোহাই, সেই ওষুধটি আমাকে খুঁজে দিন। আমাকে প্রাণে বাঁচান।

আটারসন চিঠিটার কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। বললেন, 'আশ্চর্য চিঠি! কিন্তু তুমি এই চিঠি খুললে কেন?'

'আমি খুলি নি। ওষুধের দোকানের লোকেরাই খুলে রাগ করে আমার মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছে।'

'কিন্তু হাতের লেখা তো ড. জেকিলের বলেই মনে হচ্ছে।'

'তা হোক। হাতের লেখাতে কী আসে যায়। ঘরের লোকটাকে আমি নিজে দেখেছি।'

'দেখেছ মানে? তুমি তাহলে খুনিটাকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কী বলছ এসব?'

'হ্যাঁ স্যার, আমি বাগান থেকে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছিলাম। পাশের ঘরে ঢুকে দেখি, ওষুধের ভাঙা বাক্স প্যাঁটরার মধ্যে একটা লোক। দেখলাম সেই ভাঙা বাক্স-হাতড়াচ্ছেন তিনি। আমাকে দেখেই বেদম চিৎকার করে উঠলেন। তারপর দ্রুত সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে দরজা আটকে দিলেন তিনি। এক পলকের জন্য তাঁকে আমি দেখেছিলাম। তাতেই আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। মুখে তাঁর মুখোশ আঁটা। তিনি যদি আমার মনিবই হবেন তবে মুখোশে মুখ ঢাকা কেন? আর আমাকে দেখেই চিৎকার করে ইঁদুরের মতো অমন দৌড় দেবেন কেন? তাছাড়া...

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে পুল মুখে হাত চেপে আবেগ রোধ করতে চেষ্টা করল।

সম্পূর্ণ ঘটনাটাই যে আশ্চর্যের ব্যাপার এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তোমার মনিব হয়ত দুরারোগ্য কোনো ব্যাধিতে ভুগছেন। যাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় এবং চেহারাও বিকৃত হয়ে যায়। এতে হয়ত গলার স্বরও বদলে যাওয়া অসম্ভব নয়। শরীরের এই পরিবর্তনে তিনি খুবই মুষড়ে পড়েছেন। নিজেকে লুকিয়ে রাখবার জন্য তাই মুখোশ ব্যবহার করেন। বন্ধুবান্ধবকে এড়িয়ে চলেন। নিজের স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়ে আনার জন্যে উন্মত্তের মতো তিনি ওষুধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হয়ত সেই ওষুধ ব্যবহারেই তাঁর সেরে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। দুঃখজনক এরকম পরিস্থিতি থেকে তিনি যেন উদ্ধার পান। এরকম ঘটনা পৃথিবীতে ঘটা সম্ভব। এ নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জেকিলের জন্য আমাদের আরও সহানুভূতির প্রয়োজন।

পুল বিস্মিত দৃষ্টি মেলে আটারসনের কথা শুনছিল। তারপর বলল, 'যত যাই হোক—লোকটা আমার মনিব নয় কিছুতেই। আমার মনিব লম্বা, দীর্ঘ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ আর ঘরের মধ্যে বন্দি ঐ লোকটা খুবই বেঁটে ধরনের...'

আটারসন বাধা দিয়ে কিছু বলতে গেলেন। পুল সে-কথায় কান না দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'স্যার, বিশ বছর পরে আমার মনিবকে নতুন করে চিনতে হবে? লোকটা আমার মনিব হতেই পারে না। ওই লোকটাই আমার মনিব ড. জেকিলকে খুন করেছে। ঈশ্বরই জানেন লোকটা কে? সে নিশ্চয়ই খুনি।'

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে ক্লান্ত পুল চুপ মেরে গেল। আটারসন তখন বললেন, 'তোমার ধারণা যে ভুল সেটা তো প্রমাণ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ড. বেঁচে আছেন। কাগজের টুকরোটা দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছে। হাতের

লেখা ড. জেকিলেরই। দরজাটা ভেঙে ফেললেই তো সব রহস্যের সমাধান হয়ে যায়। তোমার মনিব যাই ভাবুন না কেন, দরজা ভেঙে আমাদের ভেতরে ঢুকতে হবে।'

এতক্ষণে পুল যেন সমাধানের একটা সহজ পথ খুঁজে পেল। এ কথাটা কেন আগে তার মাথায় আসে নি? 'কিন্তু দরজাটা ভাঙবে কে?'

'কেন স্যার? আমি আর আপনি?'

'কিন্তু কীভাবে ভাঙব?'

'আমি একটা কুড়াল নিয়ে নেব। আর আপনি কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা নিয়ে নিন।'

আটারসন নিজেই দরজা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। বললেন, 'আমরাও সাংঘাতিক কোনো বিপদে পড়তে পারি।'

'তা তো বটেই। এইবার তুমি আমাকে খোলাখুলি বল, ঐ মুখোশধারীকে দেখে তুমি চিনতে পারবে।'

'তাঁকে এক পলকের জন্য দেখেছি। কাজেই চিনতে পেরেছি কি না বলতে পারব না। তবে স্যার আপনি কি মি. হাইডকে দেখেছেন? লোকটাকে দেখে অনেকটা ও রকমই মনে হয়। সে হাইডের মতোই খুব ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরা করে। আপনার হয়তো জানা আছে যে, স্যার কেরুকে খুন করার দিন থেকে লোকটা উধাও কিন্তু তাঁর কাছে ল্যাবরেটরির পেছন দিককার দরজার একটা চাবি রয়েছে। আচ্ছা স্যার, হাইডকে কি আপনি সামনাসামনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ—সে দুর্ভাগ্য একবার হয়েছিল।'

'তাহলে তো আপনি জানেনই লোকটা কী রকম বীভৎস ও কদাকার। এমনই কুৎসিত দেখতে যে তাকে দেখলে ভয় ভয় করে।'

'দেখার পর আমারও সে রকম মনে হয়েছে।'

'কী বলব স্যার, ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। একটা কথা বলব স্যার?'

'বল।'

'আমার তো মনে হয় স্যার, লোকটা হাইড ছাড়া অন্য কেউ নয়।'

'আমি সেই ভয়ই করছিলাম পুল। আমার মনে হয়, হাইড জেকিলকে খুন করে ঘরের মধ্যে বসে আছে। অমন লোকের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে পরিণতি এর চেয়ে ভালো আশা করা যায় না। এর প্রতিশোধ নেয়া উচিত আমাদের।'

তারপর ভৃত্যদের ডেকে আটারসন বুঝিয়ে দিলেন—যে করেই হোক খুনিকে ধরতে হবে। ভয় পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। পেছন দিক

দিয়ে কেউ যেন পালাতে না পারে। কয়েকজন গিয়ে লাঠি নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাক।

সব ঠিকঠাক করে আটারসন পুলকে নিয়ে ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে গেলেন। উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভয়াবহ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন আটারসন। এক খণ্ড মেঘ এসে আকাশের চাঁদটাকে তখন ঢেকে ফেলেছে। চতুর্দিকে ছমছমে নিস্তব্ধ অন্ধকার। বাতাসের দোলায় হাতের বাতিটা নিভু নিভু হয়ে আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাবরেটরি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। নগরীর কোলাহল তখন থেমে এসেছে। দূর থেকে দু-একটি শব্দের মৃদু রেশ শোনা যাচ্ছে। রাতের শান্ত, নিস্তব্ধ লন্ডন। কান পাতলে শোনা যায়, জেকিলের ঘর থেকে পায়চারির শব্দ।

পুল চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'সারা দিনরাতই লোকটা ঐ রকম অস্থির হয়ে হাঁটা-চলা করে। শুধু যখন ওষুধের দোকান থেকে কোনো নতুন ওষুধ আসে তখনই কিছুক্ষণের জন্য থামে। কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। তারপরই আবার শুরু হয় ছোটাছুটি। কান পেতে শুনুন খানিকটা—আমার মনিবের পায়ের আওয়াজ কি এরকম ছিল?'

আটারসন খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলেন। পায়ের আওয়াজ শুনে টের পাওয়া যায়, কেউ যেন বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হেঁটে বেড়ানো। জেকিলের মাটি কাঁপানো, ভারি পদশব্দের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য।

'আর কোনকিছু কখনো শোন নি?'

'তেমন কিছু নয়। তবে একদিন কান্নার ধ্বনি শুনেছিলাম।'

'কান্না! সে কি?'

'হ্যাঁ, পরাজিত মানুষের মতো, করুণ সুরে একটানা হতাশার কান্না। সে কান্না শুনলে নিজেরও কান্না পাবে স্যার।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভারী পুরু পর্দাটার দিকে তাকালেন আটারসন। পুল কুড়ালটা নামিয়ে রাখল একটা ভাঙা বাক্সের ওপর। হাতের আলোটা রাখলেন একটা টেবিলে। তারপর কম্পিত, দুরু দুরু বক্ষে দরজার গায়ে কান পাতলেন। ঘরে অবিশ্রান্ত, দ্রুত পায়চারি করে রাত্রির নীরবতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে কেউ একজন।

আটারসন চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'জেকিল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

একটু থামলেন তিনি। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না।

আটারসন আবার ডাকলেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। তোমার সন্দেহজনক আচরণ আমাদের ভালো ঠেকছে না। ভালো চাও তো দরজা খোল। নইলে আমরা জোর করে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকব।'

ভেতর থেকে জবাব এল, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে দয়া কর। আমাকে ক্ষমা কর।'

আটারসন চিৎকার করে উঠলেন, 'এ তো জেকিলের গলা নয়। এই কণ্ঠ হাইডের। আর দেরি নয়, এস পুল দরজাটা ভাঙা যাক।'

কুড়োল উঠিয়ে নিয়ে পুল জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল দরজার ওপরে। আঘাতের তীব্রতায় পুরো বাড়িটা যেন নড়েচড়ে উঠল। ঘরের ভেতরে লোকটা তখন গোঙাচ্ছে। মৃতপ্রায়, জন্তুর মতো অবোধ্য, অস্পষ্ট, কাতরস্বরে যেন সে কেঁদে কেঁদে উঠছে। যেন মরণ যন্ত্রণায় সে আক্রান্ত।

কুড়োল উঠছে এবং নামছে। দরজাটা যেমন ভারী তেমনই মজবুত। ভাঙতে চায় না সহজে। এক, দুই, তিন...আঘাতের পর আঘাত পড়তে লাগল দরজাটায়। অবশেষে দরজাটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

আটারসন অবাক হয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। কোনো শব্দ নেই। ভয়ে ভয়ে তারা উঁকি মারলেন ভেতরে। স্নিগ্ধ আলোয় সারা ঘরখানি ভরে আছে। টেবিলের ওপর ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য কাগজপত্র। চুলো জ্বলছে। সেখানে কেটলি চাপানো। বাষ্প বেরুচ্ছে শোঁ শোঁ শব্দে। পাশে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ।

ঘরের মাঝখানে, কার্পেটের ওপর একটা লোক উপুড় হয়ে নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে। শরীরটা তার দুমড়ে মুচড়ে কুঁকড়ে গেছে। তখনো তার শরীর কাঁপছে মৃদু মৃদু।

দুজনে তারা অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে লোকটিকে শুইয়ে দিলেন। দেখা গেল—লোকটা মি. হাইড। বড় মাপের ঢিলেঢালা জামা কাপড় তার পরনে। তারা দেখেই চিনলেন—এসব ডক্টর জেকিলের পরিচিত পোশাক। হাইডের মুখের পেশিগুলো নড়াচড়া করলেও আসলে তাঁর দেহে তখন প্রাণ নেই। তাঁর হাতের মুঠিতে ধরা একটা ভাঙা শিশি। ঘরের ভেতরে এসিডের তীব্র গন্ধ। কারো বুঝতে বাকি রইল না যে, হাইড বিষপানে আত্মহত্যা করেছে।

আটারসন তখন বললেন, 'আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে। বাঁচানোর জন্যই হোক আর তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যই হোক—হাইড এখন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এখন আমাদের আসল কাজ হল—ডক্টর জেকিলকে খুঁজে বের করা।

সকলে মিলে সমস্ত বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। বন্ধ ঘরের কোণা-ঘুপচি, সিঁড়ি-ঘর, লম্বা বারান্দা, হলরুম—কোথাও নেই। জীবিত কিংবা মৃত কোনো অবস্থাতেই জেকিলকে পাওয়া গেল না।

বাড়ির পেছন দিকের প্রায় সম্পূর্ণটা নিয়ে জেকিলের গবেষণাগার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই যে ঘরটা পড়ে সেটা একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরি। পুল ও আটারসন মিলে এই ঘরের দরজাই ভেঙেছিলেন। নিচের তলার ঘরগুলো পার হয়ে একটা টানা বারান্দা। সেটা গিয়ে মিশেছে সেই রহস্যজনক দরজায়। এই দরজা দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ল্যাবরেটরি ঘরে যাওয়া যায়। জিনিসপত্রে ঠাসা সমস্ত ঘর তারা আঁতিপাতি করে খুঁজলেন—সব চেষ্টাই বৃথা। জেকিলের কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না। একধারে রাজ্যের কাঠ-খড় বোঝাই একটা গুদাম ঘর। তার দরজার ওপর মাকড়সার জাল। দেখেই বোঝা যায়, এ ঘরে মানুষ তো দূরের কথা, সূর্যের আলোও ঢোকেনি বহুদিন।

চারধারে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আটারসন সেই রহস্যজনক দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ভাবলেন, ডক্টর হয়ত এই পথেই বেরিয়ে গলি দিয়ে পালিয়ে গেছেন। এই ভেবে তিনি খুঁটে খুঁটে দরজাটি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দরজায় তালা লাগানো। একটা মরচে ধরা চাবি পড়ে রয়েছে নিচে। আটারসন বললেন, 'মনে হচ্ছে, এ পথ দিয়ে বহুদিন কেউ যাওয়া-আসা করেনি।'

পুলও সমর্থন দিল, 'কারণ চাবিটা ভাঙা।'

বাইরে খোঁজাখুঁজি করে নিরাশ হলেন তাঁরা। তারপর দুজনে সিঁড়ি বেয়ে আবার ফিরে এলেন ওপরে। ঘরটা তারা ঘুরে ফিরে ভালো করে দেখতে

লাগলেন। টেবিলের ওপর রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। কাচের ছোট ছোট টিউবে শাদা শাদা ওষুধের গুঁড়ো। দেখে মনে হয়, এই সব ওষুধ দিয়েই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। হয়ত পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পুল জানাল, 'এই ওষুধগুলোই আমি এনে দিয়েছিলাম দোকান থেকে।'

চুল্লির ওপর বসানো কেটলির পানি তখনো টগবগ করে ফুটছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন দুজনে। চুল্লির পাশেই একখানা ইজি চেয়ার। সামনে একটা টেবিল। জেকিল হয়ত এখানে বসেই অসময়ে সময়ে বিশ্রাম নিতেন। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সব তৈরি। এমন কি কাপে পর্যন্ত চিনি ঢালা হয়েছে। খোলা একটা বই পড়ে রয়েছে। জেকিল ধর্ম বিষয়ক এই বইটার বহুবার প্রশংসা করেছেন। আটারসন অবাক হয়ে দেখলেন, বইটার পাশে ডক্টর নাস্তিকের মতো অনেক মন্তব্য করেছেন।

টেবিলের ওপর পাওয়া গেল ছোট্ট একটি আয়না। এখানে আয়না যে কী কাজে লাগত দুজনে অনেক ভেবেও তা বুঝে উঠতে পারলেন না। আয়নার ভেতর দিয়ে ছাদের একটা অংশ দেখা যায়। উভয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, উনুন থেকে যে লালাভ ছায়া ছাদের ওপর প্রতিফলিত হয় তারই প্রতিচ্ছায়া পড়েছে আয়নার ভেতর। আর আয়নায় তাকালে দেখা যাচ্ছে, তাদের ভয় বিহ্বল, শুকনো মুখের প্রতিচ্ছায়া।

এবার তাদের নজরে পড়ল, ঘরের কোণে রাখা ছোট্ট একটি টেবিলের ওপর। টেবিলের ওপর জড়ো করা অসংখ্য কাগজপত্র। ড্রয়ারের ভেতর থাকথাক সাজানো কাগজপত্রের ওপরে একটা বড় খাম। আটারসন অবাক হয়ে দেখলেন—খামের ওপরে বড় বড় করে তাঁরই নাম লেখা। ডক্টর জেকিলের স্পষ্ট হস্তাক্ষর। সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার ভেঙে খামটা খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকখানা খাম। একখানা ডক্টরের উইল। মাস ছয়েক আগে ফেরত দেয়া উইলের মতোই উপরে একই কথা লেখা রয়েছে। মৃত্যু এবং অন্তর্ধানের পরেই যেন এটা খোলা হয়। একই কথা, একই ভাষা—তবে এডোয়ার্ড হাইডের নামের বদলে লেখা আছে গ্যাব্রিয়েল জন আটারসনের নাম।

আটারসন অবাক হয়ে পুলের দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন কাগজটার প্রতি। নিজের অজান্তেই দৃষ্টি গেল, কার্পেটে শোয়া ড. জেকিলের মৃত হত্যাকারীর ওপর। ধীরে ধীরে স্বগতোক্তির মতো করে তিনি বলে উঠলেন, আমার মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। খুনি লোকটা তো গত কয়েকদিন ধরে এই ঘরেই আবদ্ধ ছিল। উইলখানাও সে নিশ্চয়ই দেখেছে। আমার প্রতি ওর হঠাৎ খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। উইলটা তো ওর পুড়িয়ে ফেলারই কথা। কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

এরপর দ্বিতীয় কাগজখানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন আটারসন। কাগজের ওপরে ডক্টরের হাতের লেখায় আজকের তারিখ দেয়া।

শিউরে উঠলেন আটারসন। কান্নার স্বরে তিনি ভেঙে পড়লেন, 'দেখ পুল, ডক্টর হয়ত কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং এ ঘরেই ছিলেন।' কিন্তু এরই মধ্যে তিনি কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন? নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে আছেন এবং সুযোগ বুঝে পালিয়েছেন। কিন্তু তিনি পালাবেন কেন? কোন পথ দিয়েই বা পালাবেন? তাকে হত্যা করে এত অল্প সময়ের মধ্যে গায়েব করাও তো সম্ভব নয়? তাহলে আবার হাইড আত্মহত্যা করলেন কেন?

এইসব ভেবে আটারসনের মাথায় আরও জট পাকিয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, 'পুল, সাবধান। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। তোমার মনিব হয়ত আরও ভয়ঙ্কর কোনো ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে পারেন।

পুল ভয়ে ভয়ে বলল, 'চিঠিটাতে কী আছে সেটা একবার পড়ে দেখলে হয় না।'

'আমার ভয় লাগছে পুল। চিঠিটা পড়তেও আমার ভয় লাগছে। আচ্ছা দেখা যাক—

আটারসন চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন—

প্রিয় আটারসন,

যখন এ চিঠি তুমি পাবে তখন আমি হয়ত তোমাদের ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে। কোন অবস্থায় যে আমার মৃত্যু ঘটবে তা আমি ধারণা করতে পারছি না। তবে আমার মৃত্যু যে সন্নিকটে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। দারুণ বিপর্যয়ে আমি ক্ষত-বিক্ষত। মৃত্যু ছাড়া আমার পরিত্রাণের উপায় নেই।

যা হোক, ড. ল্যানিয়ন মৃত্যুর আগে সিলমোহর করা যে খাম তোমাকে দিয়ে গেছে এখন সেটা পড়তে পার। এরপরও যদি তোমার কৌতূহল বাকি থাকে তবে তুমি আমার জবানবন্দি পড়ে নিও। সেটাও এই সঙ্গে রেখে গেলাম।

পড়লেই সব জানতে পারবে। ইতি—

তোমার অযোগ্য ও দুর্ভাগা বন্ধু

হেনরি জেকিল

সিল-মারা আরেকটা মোটা খাম পড়ে ছিল মেঝের ওপর। পুল সেটা উঠিয়ে আটারসনের হাতে দিল। তিনি সেটা কোটের বড় পকেটে রাখলেন।

আটারসন তারপর বললেন, পুল, এসব চিঠির কথা কাউকেই বলো না। এখন দশটা বেজে গেছে। আমি বাড়ি গিয়ে এই চিঠিটা আর ল্যানিয়নের চিঠিটা ঠাণ্ডা মাথায় পড়ে দেখতে চাই। রাত বারোটার মধ্যেই আমি আবার ফিরে আসব। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব। কী করা উচিত আমাদের। তখনই না হয় পুলিশকে খবর দেয়া যাবে। এখন যে জিনিস যেমন আছে তেমনি থাক।

ঘরে তালা মেরে দুজনেই বেরিয়ে এলেন। আটারসন চলে যাবার পরও ভৃত্যেরা ভয়ে আতঙ্কে আগুনের ধারে চুপচাপ বসে রইল।

বাড়ি এসে আটারসন একে একে খাম খুলে জবানবন্দি দুটো পড়লেন। প্রথমখানা ল্যানিয়নের—মৃত্যুর পূর্বে তিনি আটারসনের জন্য যা লিখে রেখে গিয়েছিলেন এবং তারই শর্তমতো আটারসন যেটা খোলেন নি। অপরটি এইমাত্র পাওয়া ড. জেকিলের জবানবন্দি। যে জবানবন্দি দুটোতে সমস্ত রহস্যেরই মীমাংসা রয়েছে।

জবানবন্দি দুটো পড়ে আটারসন অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রাইলেন।

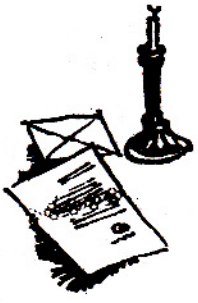

ড. ল্যানিয়নের জবানবন্দি

আজ ৯ জানুয়ারি।

আজ থেকে চারদিন আগে এরকম এক সন্ধ্যায় আমার স্কুলজীবনের বন্ধু ও প্রাক্তন সহকর্মী হেনরি জেকিলের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পাই। চিঠিটা পেয়ে খুবই অবাক হলাম আমি। আমাদের মধ্যে কোনোদিনই চিঠি লেখালেখির অভ্যাস ছিল না। গত রাতেও জেকিলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। একই সঙ্গে গল্পগুজব করেছি। খানাদানা করেছি। কিন্তু এরই মধ্যে এমন কী ঘটল যার জন্য রেজিস্ট্রি ডাকে জেকিল একটা চিঠি পাঠাল আমাকে।

চিঠি পড়ে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। চিঠিটা ছিল এ রকম—

প্রিয় ল্যানিয়ন

১০ ডিসেম্বর ১৮—।

তুমি আমার পুরনো বন্ধুদের অন্যতম, যদিও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু প্রশ্ন নিয়ে মত-পার্থক্য হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসায় কোনো ভাঙন ধরে নি। ল্যানিয়ন, তুমি যদি কোনোদিন আমায় বলতে পার যে জেকিল, আমার জীবন, আমার মান-সম্মান, আমার সবকিছু তোমার উপর নির্ভর করছে—তাহলে আমি তোমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতাম। সমস্ত টাকা পয়সা ব্যয় করতাম তোমার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার হাত

উন্মুক্ত থাকত তোমাকে সাহায্যের জন্যে। প্রিয় ল্যানিয়ন, আজ আমার জীবন, আমার মান-সম্মান, আমার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তোমার ভালোবাসার ওপর, করুণার ওপর। আজ যদি তুমি আমায় সাহায্য না কর তাহলে নিশ্চিত জেনো আমি হারিয়ে যাব এই পৃথিবী থেকে। তুমি হয়ত ভাবছ—আমি তোমার কাছ থেকে অন্যায় কিছু দাবি করব। সেটা ভাবা উচিত হবে না। কারণ চিঠিটা সম্পূর্ণ পড়লে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কেন আমার এই করুণা-ভিক্ষা?

তোমার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আজ রাত্রে তোমার যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন, সব ফেলে তোমাকে আমার বাসায় আসতেই হবে। সন্ধ্যা রাত্রেই গাড়ি নিয়ে সোজা আমার বাসায় চলে আসবে। এখানে পুল তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। সঙ্গে থাকবে একজন তালাচাবিঅলা। তুমি আমার ল্যাবরেটরি রুমের দরজা ভেঙে একাই ভেতরে ঢুকবে। তোমার হাতের বাঁ দিকে থাকবে একটা ক্যাবিনেট ফাইল। যদি ড্রয়ারগুলো খোলা না থাকে তবে ভাঙার ব্যবস্থা করবে। নিচের দিক থেকে তৃতীয় কিংবা উপরের দিক থেকে চতুর্থ ড্রয়ারটা টেনে বের করবে।

আমার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। এক ধরনের ভয়াল শূন্যতা আমাকে গ্রাস করেছে। আমি তোমাকে ঠিকমতো নির্দেশ দিতে পারছি কি না জানি না। তবে ড্রয়ারে যদি কিছু গুঁড়ো ওষুধ, একটা শিশি আর কিছু কাগজপত্র পাও তবে বুঝবে—এই ড্রয়ারটাই প্রয়োজন। সব জিনিসপত্রসহ ড্রয়ারটিকে তুমি যত্ন করে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।

এই হল তোমার প্রথম কাজ। এরপরও কাজ বাকি আছে। রাত্রে তোমার কনসালটিং রুমে তুমি একটু অপেক্ষা করবে। রাত যখন নীরব হয়ে আসবে, বাড়ির লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমার নাম করে একজন লোক উপস্থিত হবে তোমার কাছে। নিজ হাতে তাকে দরজা খুলে দিও। এবং যে ড্রয়ারটা তুমি আমার বাড়ি থেকে নিয়ে গেলে বিনা দ্বিধায় সেটা তুলে দিও তার হাতে। এটুকুই তোমার কাজ—এর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে। এই কাজের জন্য তোমার যদি কোনো সংশয় থাকে, ব্যাকুলতা থাকে পাঁচ মিনিট পরেই কিন্তু তুমি সব জানতে পারবে। তখনই বুঝতে পারবে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাজটা। সম্পূর্ণ কার্যক্রমটাই তোমার কাছে অদ্ভুত বলে

মনে হতে পারে। কিন্তু তোমার সামান্য অবহেলার জন্য আমার মৃত্যু কিংবা উন্মাদ অবস্থার জন্য চিরকাল তুমি তোমার বিবেকের কাছে দায়ী থাকবে।

আমি জানি, তুমি আমার এই করুণ অনুরোধ কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারবে না। এর কোনোরূপ অন্যথা কোরো না। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটবে ভাবতেই আমার শরীর হিম হয়ে আসছে, হাত কাঁপছে। তুমি আমার অবর্ণনীয়, কষ্টকর, মর্মান্তিক মুহূর্তগুলোর কথা ভাব। নিরাশার কালো অন্ধকারে এখন একমাত্র তুমিই আমার আশার আলো। তুমি যদি আমাকে সময় মতো সাহায্য কর তবেই আমি বিপদ থেকে উদ্ধার পাব।

ল্যানিয়ন, তোমার বন্ধুকে বাঁচাও, উদ্ধার করো। ইতি তোমার বন্ধু—

হেনরি জেকিল।

পুনশ্চ : চিঠিটা ডাকে দেয়ার আগেই আরেকটা ভয়ানক কথা মনে হল। ডাক বিভাগের গোলমালে এই চিঠি যদি তোমার হাতে কাল সকালের মধ্যে না পৌঁছায় তখন কী হবে? ঐ রাত্রিতে ঘটনাগুলো যদি না ঘটে তবে জানবে ল্যানিয়ন—তুমি তোমার বন্ধু হেনরি জেকিলের আর দেখা পাবে না।

চিঠিটা পড়ে স্বাভাবিকভাবেই মনে হল, আমার প্রিয় বন্ধুটি পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বা ভাবি কীভাবে! তা ভাবার আগে আমি তাঁর অনুরোধ পালন করতে বাধ্য। এইরকম করুণ, আকুল আবেদন পালন না করার কোনো উপায় নেই। এ দায়িত্বটুকু আমাকে নিতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে চেপে আমি জেকিলের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। পুল সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমারই মতো সেও একখানা নির্দেশ-পত্র পেয়েছে। কথা মতো একজন তালাঅলা এবং কাঠমিস্ত্রি সংগ্রহ করে সে উপস্থিত। আমরা পুরনো ল্যাবরেটরি রুমের দিকে রওনা দিলাম। জেকিলের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় ঘরটি খুবই সংরক্ষিত। ভারী কাঠের দরজা এবং শক্ত তালা ঝুলছে সেখানে। প্রায় দু-ঘণ্টা-ধরে কাজ করার পরে তালা ভেঙে দরজাটা খোলা গেল। প্রয়োজনীয় ড্রয়ারটি সংগ্রহ করে আমি বাসায় ফিরে এলাম।

বাড়িতে ফিরে ড্রয়ারের জিনিসপত্রগুলো আমি নেড়েচেড়ে দেখলাম। কিছু গুঁড়ো পড়ে রয়েছে যেগুলো ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় না। হয়তো জেকিলের নিজের হাতেই তৈরি। একটা কাগজের মোড়ক খুলে দেখা

গেল—তার মধ্যে সাদা সাদা স্ফটিক লবণ। একটা শিশির ওপর আমার চোখ পড়ল। রক্তলাল তরল পদার্থে শিশিটা অর্ধেক ভরা। খুবই তীব্র গন্ধ, মনে হল, ফসফরাস ও ইথার মিলিয়ে তরল পদার্থটি তৈরি। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস রয়েছে যা শনাক্ত করা গেল না।

আর একটা বই রয়েছে, সেটা আসলে একটা ডায়েরি। ডায়েরিটায় কতকগুলো তারিখ ছাড়া বিশেষ কিছু লেখা নেই। তারিখগুলো অনেক আগের। দেখে বোঝা গেল, গত কয়েক বছর ধরেই ডায়েরিটা লেখা হয়েছে। কিন্তু বছরখানেক আগে থেকে হঠাৎ তারিখ লেখা বন্ধ রয়েছে। ডায়েরিতে মাঝে মধ্যে মন্তব্য লেখা আছে। দু-একটি শব্দের বেশি নয়। 'ডবল' শব্দটি ছয়বার ব্যবহার করা হয়েছে। 'সম্পূর্ণ ব্যর্থ' শব্দটি লেখা আছে শুরুর দিকে।

এসব দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। এসবের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছু সাদা গুঁড়ো লবণ, এক শিশি তরল পদার্থ, নোট বইয়ে লেখা কিছু দুর্বোধ্য মন্তব্য থেকে কিছুই উদ্ধার করা গেল না। তবে এইটুকু বোঝা গেল, এ সবই আমার বন্ধু ড. জেকিলের খামখেয়ালি গবেষণার সরঞ্জামপত্র। এসবের সঙ্গে আমার বন্ধুর মানসম্মান জীবনের কী সম্পর্ক তা আমার বোধগম্য হল না। আর ভেবে দেখলাম, এসবের জন্য জেকিলের লোক যদি আমার বাসায় আসতে পারে তবে জেকিলের বাসায় যেতে তার বাধা কোথায়! আমার সঙ্গে তাঁর গোপনেই বা দেখা করার প্রয়োজন কী? এসব যতই ভাবছিলাম, ততই আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে, জেকিল নিশ্চয়ই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। যা হোক, চাকর বাকরদের বিদায় করে দিয়ে আমি রুমে অপেক্ষা করতে লাগলাম একা। আত্মরক্ষার জন্য গুলিভরা একটা পিস্তল লুকিয়ে রাখলাম নিজের কাছে।

লন্ডনের বুকে তখন নেমে এসেছে রাত বারোটার নৈঃশব্দ্য। এমন সময় কে যেন আমার ঘরের দরজায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল। আমি নিজের হাতে দরজা খুললাম। দেখি, একজন বেঁটেমতো কদাকার লোক দরজার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকেই কি ড. জেকিল আমার কাছে পাঠিয়েছেন।'

'হ্যাঁ'। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই লোকটা ভীত-সন্ত্রস্তভাবে বাইরের দিকে তাকাল।

আমি তাকে ভেতরে আসতে বললাম। সে আবারও সন্ধানী দৃষ্টিতে বাইরে তাকাল। দূরে একজন পুলিশকে দেখা যাচ্ছে। পুলিশটা এদিক-পানে আসতেই বেঁটে লোকটা দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আগন্তুকের আচার আচরণে আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কোনো কথা না বলে, পকেটের রিভলবারটা হাতে চেপে, আমি আমার ঘরে ঢুকলাম। তারপর লোকটার সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। আগেই বলেছি, লোকটা খর্বাকৃতি। দেখতে কুৎসিত, তার চেহারায় এমন একটা ব্যাপার আছে যা দেখলেই ভয় লাগে। গড়নে ছোট হলে কী হবে—শরীরে এক ধরনের জান্তব শক্তির ছাপ রয়েছে। তার চোখে মুখে নিষ্ঠুর হিংস্রতা। দেখতে সে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো নয়, বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর। তাকে দেখে একাধারে ভয় ও চরম বিরক্তি উৎপাদন হবে।

অদ্ভুত রকমের হাস্যকর তার পরনের পোশাক-আশাক। যদিও তা খুব দামি কাপড়ের তৈরি কিন্তু সেগুলো তার গায়ে খুবই ঢিলেঢালা এবং বেখাপ্পা ধরনের। প্যান্টের ঝুল পায়ের চেয়ে বড়। কোটের হাতা নেমে এসেছে। কলারটাও তার কাঁধ ছাপিয়ে অনেক বড়।

হাস্যকর পোশাক পরনে থাকলেও আমার হাসি এল না। বরং অজানা আতঙ্কে বারবার আমি শিউরে উঠলাম। তার চেহারার মধ্যেই কী যেন লুকিয়ে রয়েছে যা দেখলে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। লোকটা কে, কোথা থেকে এসেছে—তার ধরন দেখে এসব নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে আঁকুপাকু করে উঠল। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করা হল না।

ক্ষণিক মুহূর্তগুলোর মধ্যে তাকে নিরীক্ষণ করছিলাম। সে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সে অধীর আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কোথায় আমার জিনিস? ড্রয়ারটা তুমি কি পেয়েছ? কোথায় সেটা?

অধৈর্য হয়ে আমার কাঁধ ধরে সে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। তার স্পর্শে আমার শরীর যেন হিম হয়ে আসছে। আমি হতচকিত হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম,

'দেখুন, এখনো আপনার পরিচয় জানতে পারি নি। ব্যস্ত হবেন না। আপনি এইখানে বসুন।'

আমার মনের ভয় যেন প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে আমি সতর্ক ছিলাম। আমি এমন ভাব দেখাতে লাগলাম যেন কিছুই হয় নি। যেন আমি খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবহার করছি।

লোকটা নরমস্বরে বলল, 'আমায় ক্ষমা করুন ডক্টর ল্যানিয়ন। আমার মাথার ঠিক নাই। তাই হয়ত ভদ্র ব্যবহার করতে পারছি না। আমি অধৈর্য হয়ে রয়েছি। আপনার সহকর্মী ও বন্ধু ড. জেকিল আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। একটা ড্রয়ার...।'

এটুকু বলতেই যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় গলা ধরে এল লোকটার। যেন ওর খিঁচুনি হচ্ছে। আবার সে প্রশ্ন বরল—'সেই ড্রয়ারটা'—

'এই যে।'

টেবিলের পেছনে মেঝেতে ড্রয়ারটা ফেলে দিলাম আমি। লোকটা অতি দ্রুততার সঙ্গে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রয়ারটার ওপর। সহসাই লোকটার চেহারায় দানবীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। স্ফীত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল। ভীষণ হিংস্র ভাব ফুটে উঠল চোখে।

'আপনি শান্ত হোন।'

আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ানক অর্থহীন এক হাসি দিল লোকটা। এক ঝটকায় তারপর ড্রয়ারের ওপরের ঢাকনাটা ছিঁড়ে ফেলল। ভেতরের জিনিসপত্র দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল সে। চোখ মুখ চিকচিক করতে লাগল তার। তারপর সে গভীর প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনার কাছে ওষুধ মাপার গ্লাস আছে কি?'

আমি আরও অবাক হয়ে গ্লাস এনে দিলাম। এবারে লোকটি শিশি থেকে লাল তরল পদার্থ ঢালল। মাপমতো তাতে শাদা গুঁড়ো ঢেলে দ্রবণ নাড়াচাড়া করতে লাগল। গ্লাসে মেশানো তরল পদার্থটা প্রথমে হালকা বাদামি পরে গাঢ় লাল হয়ে উঠল। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া বন্ধ হলে তরল পদার্থটা হালকা সবুজ রঙে পরিবর্তিত হল।

লোকটি ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করছিল। রংটা হালকা সবুজ হয়ে এলে লোকটার মুখে সাফল্যের হাসি খেলে গেল।

এইবার গ্লাসটা হাতে নিয়ে লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার চেষ্টা সার্থক। এখন বলুন, আমি কি গ্লাসটা নিয়ে আপনার এখান থেকে চলে যাব? নাকি আপনার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে? আপনি একজন বেদনার্ত মুমূর্ষু লোকের জন্য যা করেছেন তাতে আপনার আত্মার

কল্যাণ হোক। আমাকে এখন বিদায় দিলে আপনার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনি যদি কৌতূহল মেটাতে চান তবে আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। মানুষের চিন্তার অতীত, জ্ঞানের এক আশ্চর্য দিগন্ত উন্মোচিত হবে আপনার সামনে। সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে সুখকর নাও হতে পারে। ভালো করে ভেবে দেখুন—এই স্থানে, এই ঘরে, এই মুহূর্তে ঘটবে সেই আশ্চর্য ঘটনা।

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি তখন দিশেহারা। তবু গলার স্বর স্থির রেখে বললাম, 'আপনার কথাগুলো খুবই অস্পষ্ট, অবোধ্য মনে হচ্ছে আমার কাছে। সবকিছুই যে বিশ্বাস করছি তা নয় তবে রহস্যের শেষ আমি দেখতে চাই।'

আগন্তুক জবাব দিল, 'বেশ তাই হবে। তবে ডক্টর ল্যানিয়ন, আপনি যা দেখবেন তা কাউকে বলতে পারবেন না। আপনি চিরদিনই খুব সঙ্কীর্ণ, উদার চিন্তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। পুরনো বিশ্বাস নিয়ে আপনি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। আপনার জ্ঞানের বাইরে যেসব ওষুধ থাকতে পারে আপনি তাদের দ্রব্যগুণ বিশ্বাস করেন না। আপনার চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠ আপনি তাদের জ্ঞানকে কঠোর বিদ্রূপ করেন। তাহলে এইবার, দেখুন স্বচক্ষে—'

কথা শেষ করেই লোকটা এক নিঃশ্বাসে তরল পদার্থটুকু গিলে ফেলল। তারপর বিকট আর্তনাদ করে ছটফট করতে লাগল লোকটা। সে কী কাতরানি আর করুণ গোঙানীর মতো কান্না! সামনের টেবিলটা ধরে কোনোরকমে নিজেকে সামলে রাখল সে। শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি তার দিকে। ফুলে ফুলে উঠছে তার বীভৎস চেহারাটা। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস পড়তে লাগল। হঠাৎ করেই তার মুখটা কালো হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম, লোকটার শরীরের আকার যেন বদলে যাচ্ছে।

এসব দেখে ভয়ে আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। কোনোমতে দেয়ালে হেলান দিয়ে এই অলৌকিক ভয়ঙ্কর ঘটনা থেকে মুক্তি পেতে চাইলাম।

হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর! বিড়বিড় করতে লাগলাম আমি। এরপর যা দেখলাম তা আমার চিন্তা ও বিশ্বাসের বাইরে। অলৌকিক, অভূতপূর্ব এক ঘটনা! দেখলাম ভয়াল, ফ্যাকাশে চোখে লোকটা। মৃতপ্রায় অবস্থায় হাত দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করছে। আমার চোখের সামনে তখন দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ডক্টর হেনরি জেকিল।

তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে জেকিল আমাকে কী সব বলল তার একবর্ণও আমার মনে নেই। বিস্তৃতভাবে সে সব লেখার শক্তিও আমার নেই। যা দেখার আমি দেখেছি। যা শোনার তা শুনেছি। মনের ওপর বিরাট আঘাত পেয়ে আমি আমূল বদলে গেলাম। আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল

নড়ে উঠেছে। এই ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি। কোনো উত্তর পাই না।

গভীর হতাশা ও দুশ্চিন্তায় আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমার চোখ থেকে ঘুম উবে গেল। সারাক্ষণ কী এক আতঙ্ক আমাকে ঘিরে থাকে। বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তির উপায় নেই।

নৈতিক অধঃপতনের বীভৎস রূপ সে আমার সামনে উদ্‌ঘাটন করেছে। অনুতাপের করুণ অশ্রু বিসর্জন করলেও তাকে ক্ষমা করা যায় না। জেকিল তার জীবনের এই দুঃখজনক পরিণতির জন্য মাফ চেয়েছে। তার কথা ভাবলেই আমি প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠি।

আটারসন তোমাকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি—সেদিন রাত্রে বেঁটে যে কদাকার লোকটি আমার বাসায় এসেছিল তার নামই মি. হাইড। জেকিল একথা আমার কাছে স্বীকার করেছে। এই হাইডকেই কেরুর খুনি হিসাবে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—ড. ল্যানিয়ন

হেনরি জেকিলের পূর্ণাঙ্গ জবানবন্দি

১৮... সালে বিপুল ঐশ্বর্য ও দারুণ সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করি। শুধু অর্থ নয়, চারিত্রিক সৎ গুণাবলি নিয়েই জন্ম আমার। জন্মগতভাবে আমি পরিশ্রমী, জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জ্ঞান আহরণের প্রতি আমার চরম দুর্বলতা—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিশাল সম্ভাবনা। আমার দোষত্রুটির মধ্যে সবচেয়ে যেটি খারাপ সেটি হচ্ছে উদ্দাম আমোদ-প্রমোদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। একদিকে আমার ছিল দশজনের একজন হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, মাথা উঁচু করে চলার শক্তি আর অন্যদিকে ছিল হালকা আমোদ-প্রমোদের প্রতি মোহ। দুয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব নয়। তাই মনের অযাচিত চাঞ্চল্য ও আমোদপ্রিয়তাকে বিসর্জন দিয়ে এক ধরনের কপট গাম্ভীর্য নিয়ে আমি চলাফেরা করতাম। এইভাবেই আমি দ্বৈত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

আমার জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল বেশ উঁচু মানের। আমি আমার ছোটখাটো উচ্ছ্বাস ও আনন্দের ব্যাপারগুলো লজ্জার তাড়নায় লুকাতে শুরু করলাম। আমার দোষগুলো তেমন মারাত্মক কিছু না হলেও আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে লাজুক করে তুলেছিল এবং আমার সত্তা ভালো ও মন্দ এই দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। হয়ত এই দ্বিমুখী স্বভাব নিয়েই মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

আমার মধ্যে স্পষ্ট দ্বৈত সত্তা থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু ভণ্ড ছিলাম না। আমার দুটো দিকই ছিল সম্পূর্ণ আন্তরিক। আর এটাই আমাকে গভীরভাবে কষ্ট দিত। আমার বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা, গুপ্ত রহস্য ও

অতিপ্রাকৃত শক্তির রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করতে লাগল। আমি এমন একটা জ্ঞান অর্জন করলাম যেটা আমার অধঃপতনের মূল কারণ। আমার বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকতা দিয়ে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মানুষের সত্তা আসলে একক নয়, দ্বৈত। মানুষকে দ্বৈত বলছি শুধু এই জন্যেই যে, আমার জ্ঞান এই দুয়ের বেশি অতিক্রম করতে পারে নি। ভবিষ্যতের গবেষণা হয়ত উদ্‌ঘাটিত করবে যে, মানুষ আসলে অনেকগুলো স্বাধীন ব্যক্তিত্বের সমষ্টি।

স্বভাব অনুযায়ী আমি মাত্র একটা দিক ধরে এগিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার স্বভাবের নৈতিক দিকটায় ছিল দ্বৈতসত্তার অবস্থান। দুটো সত্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই হত আর আমি ভালো ও মন্দ এই দুই ভাগে তাদের আলাদা করে দেয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতাম। আমার মনে হত যদি বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে জীবন অনেক বেশি সুন্দর ও সহনীয় হয়ে উঠবে। মানুষের জীবনে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, একই লোকের মধ্যে দুটো সত্তাই বিরাজ করে ও প্রতিনিয়ত পরস্পর সংগ্রাম করে।

আমার বিজ্ঞান বিষয়ক ও গুপ্ত রহস্য বিষয়ক গবেষণায় আমি বিপুল শ্রম দিতে শুরু করলাম। আমাদের শরীরের সর্বপ্রকার যান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করলাম। এই স্থূল মানব শরীর আসলে স্পর্শের অতীত এক সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য আবরণে ঢাকা। কতগুলো দ্রব্য দেহের এই স্থূল বহিরাবরণকে ঝড়ো হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, আবার ফিরিয়েও আনতে পারে। মানুষের মাংসের খোলসটাকে নড়াচড়া করে দিতে পারে, এমন কিছু বস্তুর সন্ধান পেলাম আমি। একদিন আবিষ্কার করলাম যে, কিছু রাসায়নিক উপাদানের ক্ষমতা আছে একটি সত্তাকে সরিয়ে দিয়ে অপরটিকে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করতে দেয়ার। সংগত কারণেই আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ বিবরণ আমি দেব না। কারণ মানুষ যে জীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাকে আমূল পরিবর্তন করতে গেলে জীবনের ওপর যন্ত্রণা ও চাপ বাড়বে বই কমবে না। আর আমার এই বিবৃতি থেকেই জানা যাবে যে, আমার আবিষ্কার অসম্পূর্ণ ছিল। কাজেই আমি শুধু বলব যে আমি একটা মাদক ওষুধ তৈরি করেছিলাম যা আমার একটা সত্তাকে সরিয়ে আমার প্রকৃতির খারাপ দিকটিকে উপস্থাপিত করত। এই খারাপ দিকটিও ছিল আমার চরিত্রের স্বাভাবিক ব্যাপার। আমার চৈতন্যের নিকৃষ্ট উপাদানসমূহের সমন্বয়ে সেটা গঠিত।

এই পরীক্ষার আগে আমি দীর্ঘসময় ইতস্তত করেছিলাম। আমি জানতাম এটা জীবন নিয়ে ভয়ঙ্কর এক খেলা। এই ধরনের শক্তিশালী মাদকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিন্তু এই নতুন আবিষ্কারের প্রলোভনে আমি সব ভয়কে জয় করলাম। ওষুধ তৈরির যাবতীয় উপাদান আমি সংগ্রহ করি। শেষ যে

উপাদানটি প্রয়োজন ছিল তা হল এক ধরনের লবণ। এই লবণ আমি একজন ওষুধ বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছিলাম।

তারপর একদিন এক অভিশপ্ত রাতে আমি লবণটা মেশালাম। বুদবুদ উঠল ও ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল ওষুধটা। এক অবর্ণনীয় সাহস ও আবেগে তৈরি ওষুধটা এক ঢোকে আমি পান করলাম।

তীব্র যন্ত্রণায় আমার শরীর কেঁপে উঠল, হাড়গুলো যেন গুঁড়িয়ে গেল আর একটা ভৌতিক আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল। হাড়ের মধ্যে অসহ্য ব্যথা, শরীর ঘুলিয়ে উঠল। মানসিক বিপর্যয় ঘটল দ্রুত। জন্মের বা মৃত্যুর সময়কার যন্ত্রণার চেয়েও বেশি যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হলাম আমি। তারপরই দ্রুত সব যন্ত্রণা কমে এল। যেন কঠিন কোনো ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করলাম। একটা আশ্চর্য, নতুন রকমের রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। আমার মনে হল বয়স কমে গেছে। শিরায় শিরায় খেলে গেল যৌবনের অমিত রক্ত-প্রবাহ। শরীর অনেকটা হালকা হল। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অযাচিত অনুভব করলাম আমি। যেন সবরকম বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজেকে দুষ্ট ও পাপাচারী বলে মনে হল। কিন্তু তা আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল। আমার ভেতরের আদিম খারাপ প্রবৃত্তির ক্রীতদাসে তখন আমি পরিণত হয়েছি। আমি নবজীবনের আনন্দে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়েই টের পেলাম যে আমার উচ্চতা কমে গেছে। এখন আমি খর্বাকৃতি।

সেই সময় আমার ঘরে কোনো আয়না ছিল না। এখন যেটা আছে সেটা পরে আনানো হয়েছিল। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করার জন্যে আমি আয়না ব্যবহার করতাম। যাই হোক, তখন রাত্রি অনেক গভীর। বাড়ির ভৃত্য-পরিচারক সবাই তখন গভীর ঘুমে। আমি ঠিক করলাম, ঝুঁকি নিয়ে আমার এই নতুন চেহারায় আমি আমার শোবার ঘরে যাব। যখন আমি উঠোন পেরোচ্ছিলাম তারারা আকাশ থেকে ঘৃণার অগ্নিদৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। আমার নিজের বাড়িতে অচেনা আগন্তুকের মতো গোপনে আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। শোবার ঘরে ঢুকেই আমি নিজেকে প্রথমবারের মতো দেখলাম—এডওয়ার্ড হাইডরূপে।

এখানে তত্ত্ব থেকে নিশ্চয় আমি বলব আমার ভেতরের ভালোর চেয়ে মন্দের অংশটা সর্বদাই কম শক্তিশালী। তাই খারাপ দিকটা খুবই দুর্বল ও হালকাভাবে ফুটে উঠেছে চেহারায়। ভালোটাকে ছেড়ে মন্দটাকে রূপ দেয়ামাত্রই সেটা ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করেছে। যতই হোক, আমার জীবনের বেশিরভাগটাই আমি ছিলাম সৎ, কঠোর পরিশ্রমী ও জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী।

সেই কারণে অবদমিত খারাপ দিকটা ছিল তুলনায় দুর্বল। তাই আমার মনে হয় হাইড ছিল জেকিলের তুলনায় ছোট ও অল্পবয়স্ক। হেনরি জেকিলের মুখে ছিল পবিত্রভাব। অন্যদিকে এডওয়ার্ড হাইডের মুখে আঁকা ছিল শয়তানির ছাপ।

আয়নায় ঐ কুৎসিত মুখ দেখে আমি কোনো বিতৃষ্ণা অনুভব করি নি। কারণ এটাও আমারই রূপ। আমারই দ্বিখণ্ডিত সত্তা। আমার স্বাভাবিক মুখের তুলনায় একে আরও বেশি জীবন্ত, বেশি স্পষ্ট বলে মনে হল।

লক্ষ্য করেছি, যখন আমি হাইডের রূপ ধারণ করতাম তখন যারা আমাকে দেখত তারা কেমন যেন আতঙ্কে পিছিয়ে যেত। তার কারণ এই হতে পারে যে সমস্ত মানুষই ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণে গড়া; হাইডই একমাত্র ব্যক্তি যে পুরোটাই মন্দ।

আয়নার সামনে আমি খুব অল্প সময়ই নষ্ট করলাম। কারণ পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশ তখনও বাকি। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, আমার আসল চেহারাটা আমি বরাবরের মতোই হারিয়ে ফেললাম কি না! যদি তাই হয়, তবে দিনের আলো ফোটার আগেই এই বাড়ি ছেড়ে আমাকে পালাতে হবে। কারণ এই বাড়িটা তখন আমার থাকবে না। আমি তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরি কক্ষে ফিরে এলাম। দ্রুত মিশ্রণটা তৈরি করে পান করলাম। আবারও শরীরে সেই অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম এবং ক্রমশ হেনরি জেকিলের মুখ ও চেহারা ফিরে পেলাম।

আমার কর্মজীবনের উন্নতির এক সংকটময় মুহূর্তে সেদিন আমি পৌঁছে গেলাম। যদি আমি একটা পবিত্র মনোভাবের মধ্যে পরীক্ষাটা করতাম তবে ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হত। হয়ত নির্ভেজাল শয়তান হাইডের পরিবর্তে আমি এক অতি পবিত্র দেবদূতে পরিণত হতে পারতাম। ওষুধের কোনো দোষ নেই। সে আমার ভেতরের ভালো প্রবৃত্তিটাকে ঘুম পাড়িয়ে মন্দ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। তাই এডওয়ার্ড হাইডের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে অবলীলায়। সুতরাং এখন আমার দুটো চরিত্র। একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মন্দ হাইড। অন্যটা ভালো মন্দ মিশিয়ে সাধারণ জেকিল। পরিবর্তনটা হয়েছিল সম্পূর্ণ খারাপের দিকে। সেটা সম্পূর্ণ ভালোর দিকেও হতে পারত!

সেই ভয়াবহ রাত্রির পর থেকে আমি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে লাগলাম। দুটি আলাদা চরিত্র ও চেহারার অধিকারী হয়ে আমার মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল। পড়াশুনা ও গবেষণা করে আমার জীবন একঘেয়েভাবে কেটে যাচ্ছিল কিন্তু আমার অবদমিত মানুষটি জেগে উঠতে চাইত প্রায়শ। আমি একজন সম্মানিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আমার পক্ষে অশোভন কোনো কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু নতুন

ক্ষমতা আমাকে ঘন ঘন প্রলুব্ধ করতে লাগল। সামান্য একটু ওষুধ খাওয়ার অবকাশমাত্র, পরমুহূর্তেই স্বনামধন্য, ডক্টর হেনরি জেকিলের স্থলে পাপিষ্ঠ হাইডের আবির্ভাব। কী মজার খেলা! মাঝে মাঝে কৌতুকও বোধ করতাম আমি। হাইডের ছদ্মবেশে নির্ভয়ে আমি আমার মনের অবদমিত কামনাকে তৃপ্ত করতে পারতাম। আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলাম, কারণ এডওয়ার্ড হাইডের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। কেবল রসায়নাগারে গিয়ে ওষুধটা পান করতে হত। ব্যস—এডওয়ার্ড হাইড অদৃশ্য হয়ে যেত এবং তার স্থানে এসে যেতেন সম্মানিত ও সকলের শ্রদ্ধেয় ড. হেনরি জেকিল। কিন্তু এই রকম জীবনযাপন করতে গিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হত আমাকে। যাবতীয় ব্যবস্থা খুব যত্নের সঙ্গে করে রাখতে হত আমাকে। সোহো স্ট্রিটে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। সেখানে নিয়োগ করেছিলাম একজন পরিচারিকা। সে চুপচাপ ও নির্ভরযোগ্য। আমি আমার চাকর-বাকরদের বলে দিয়েছিলাম, এ বাড়িতে মি. হাইডের অবাধ যাতায়াত থাকবে। তাকে যেন কোনো ধরনের বাধা দেয়া না হয়। এমন কি আমি হাইডকে পরিচিত করানোর জন্য ঘন ঘন যাতায়াত করতাম এ বাড়িতে।

তারপর আমি সেই উইলটা তৈরি করলাম—যে উইল সম্পর্কে আমার বন্ধু আটারসন তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। উইলের মূল লক্ষ্য ছিল, জেকিল-অবস্থায় কোনো কিছু ঘটলে হাইডরূপে টাকা পয়সা ভোগ করার ব্যাপারে আমার যেন কোনো রকম অসুবিধা না হয়। এভাবে চতুর্দিকে সতর্ক হয়ে আমার নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে এই ধরনের জীবনযাপন করতে লাগলাম।

শুনেছি, সমাজে অনেক সম্মানিত লোক ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে অপরাধ করে থাকে। এতে সব সময় তাদের মান-সম্মান ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন থাকে এমন নয়। আমার পক্ষে নিরাপত্তার কোনো প্রশ্ন আসে না। খেয়াল খুশিমতো, স্কুলের ছাত্রের মতো, ভদ্রতার মুখোশ ফেলে দিয়ে অবাধ স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ আমি উপভোগ করতে পারি। আমি বেশি নিরাপদ কারণ আমি মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধের আড়ালে চলে যেতে পারি। ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়ে ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাইডের অস্তিত্ব মুছে যায়, আয়নায় দাগের মতো মুছে যায় তার মূর্তি। তখন সামনে থাকে সৌম্য মূর্তি হেনরি জেকিল গভীর অধ্যয়নে মগ্ন। কার সাধ্য তাকে সন্দেহ করবে?

আমার নিজের জীবনের ভেতর আমি জীবনের রুচিহীন আনন্দের সন্ধান করতাম। কিন্তু হাইডের হাতে পড়ে সেগুলো হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর।

আমার ভেতরের পশুবৃত্তি দেখে আমি নিজেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। হাইড ছিল অপকারী, দুর্বৃত্ত। অমানবিকভাবে অন্যকে পীড়ন করতে সে দ্বিধা করত না। হাইড ছিল খুবই নির্দয়। পাপ কাজে পাথরের মতো সে অবিচল থাকত। এতে আমার কোনো বিবেকের দংশন হত না। বিবেক যন্ত্রণা আমার কম ছিল এই কারণে যে, যতই হোক ও যে হাইড, এবং কেবল হাইডই—সেই একমাত্র দোষী। জেকিল তার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। তার ভালো গুণগুলো একইরকম আছে। জেকিল তো হাইডের করা অপরাধের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। এইসব ভেবেই আমার বিবেকের দংশন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসত।

যাক সে সব কথা।

যে পাপ ও নৃশংস কার্যকলাপের মধ্যে আমি ডুবে গিয়েছিলাম তার বিশদ বর্ণনায় আমি যাব না।

শুধু দু-একটি ঘটনার আমি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করব। একদিন হঠাৎ একটি ছোট মেয়েকে আমি নিষ্ঠুর নিপীড়ন করে বিপদে পড়ে গেলাম। একজন পথচারী আমার উপর ভয়ানক রুষ্ট হলেন। তিনি ছিলেন তোমারই নিকট আত্মীয় মি. এনফিল্ড। মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনের ক্রোধ দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই তাদের নিরস্ত করার জন্য সকলকে বাড়িতে নিয়ে এসে জেকিলের নাম স্বাক্ষরিত চেক দিতে হয়। ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপদ এড়াতে আমি হাইডের নামে একটা একাউন্ট খুলেছিলাম এবং হাতের লেখার ধরন পাল্টে একটা হস্তাক্ষরও তৈরি করেছিলাম।

স্যার ড্যানভার্স কেরুর হত্যাকাণ্ডের প্রায় দুই মাস আগে, গভীর রাতে একদিন আমি বাড়ি ফিরেছি। পরদিন সকালে একটা অস্বাভাবিক অনুভূতির মধ্যে আমার ঘুম ভাঙল। আমি আমার পরিচিত ঘরটার দিকে তাকিয়ে সবকিছু চেনার চেষ্টা করলাম। মনে হল, আমার তো থাকার কথা সোহো স্ট্রিটে—হাইডের শরীর নিয়ে। এই অদ্ভুত অনুভূতি—কারণ কী আমি ভেবে পেলাম না। আধো ঘুমে, আধো জাগরণে আমি অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে তখনো শুয়ে রয়েছি। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় হঠাৎ হাতের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এই হাত জেকিলের শুভ্র, সুগঠিত হাত নয়, হাইডের সরু, লোমশ ছাইয়ের মতো সাদা হাত। খানিকক্ষণ বিস্ময়ে বিমূঢ়ভাবে আমি তাকিয়ে রইলাম। বিছানা থেকে এক লাফে উঠে আয়নার সামনে গেলাম। সেখানে যে প্রতিবিম্ব আমার চোখে পড়ল তাতে করে আমার রক্তস্রোত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি হেনরি জেকিল হিসাবে শুতে গিয়েছিলাম আর এডওয়ার্ড হাইড হয়ে জেগে উঠেছি।

এ অবস্থার কী ব্যাখ্যা দেয়া যায়? চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী? আমার ওষুধপত্র রয়েছে ল্যাবরেটরিতে। অনেকটা পথ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। তখন সকাল হয়ে গেছে। কাজের লোকেরা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। তাদের এড়িয়ে এতগুলো ঘর, বারান্দা, উঠোন পেরিয়ে ল্যাবরেটরিতে যাব কেমন করে? দুহাত দিয়ে মুখ হয়ত ঢাকা যাবে কিন্তু শরীর ঢাকব কী করে? তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে হাইডকে এই বাড়ির সকলে চেনে। তাকে বহুবার তারা আসা যাওয়া করতে দেখেছে। তাড়াতাড়ি আমি ঢিলে পোশাকটা গুটিয়ে নিয়ে কোনোমতে ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম।

এরপর দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, আমি চিন্তিতমুখে হেনরি জেকিল হয়ে প্রাতঃরাশের প্রতীক্ষায় বসে আছি নিজকক্ষে। ভালো মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারলাম না। আমার দ্বৈত অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম। ইচ্ছামতো আমি যে আকৃতি লাভ করতে পারতাম আমার অনিচ্ছাতেও এখন তা আবির্ভূত হতে শুরু করেছে। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। যদি আমি ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। আমার দ্বৈতসত্তার মধ্যে হাইডের সত্তা এখন ক্রমশ অনেক বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। কেন জানি আমার মনে হল, আমার ভেতরে হাইডের চরিত্র স্থায়ী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ চরিত্রের ভালোত্ব মরে গিয়ে খারাপ দিকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, ওষুধের ক্ষমতা সবসময়ে একইরকম কাজ দিচ্ছিল না। কখনো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছিল এবং কয়েকবার আমাকে দ্বিগুণ পরিমাণে ওষুধ ব্যবহার করতে হয়েছিল। এখন বিপদটা হল এইরকম— আগে জেকিলের চেহারাটাকে দূর করা আমার পক্ষে কঠিন হত। এখন ঠিক উল্টো। আমার আসল ও ভালো সত্তাটার ওপর আমি আস্তে আস্তে দখল হারাচ্ছি এবং আরও বেশি করে দ্বিতীয় ও খারাপ সত্তাটির বশীভূত হচ্ছি।

এখনই এই দুই রূপের মধ্যে থেকে যে কোনো একটাকে আমার বেছে নিতে হবে। জেকিল ভালো-মন্দ মেশানো বলে হাইডকে সে অনুভব করতে পারত। কিন্তু হাইড শুধুই মন্দ, তাই জেকিল সম্পর্কে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি যদি জেকিল থাকতে চাই তবে জীবনের সব আনন্দ, উচ্ছলতাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে। আর হাইড হতে চাইলে আমার জীবনের উন্নতি, উচ্চাশা ও আগ্রহকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং একাকী ও বন্ধুহীন হয়ে কাটাতে হবে।

এখন আমি কোনটা হয়ে থাকব? এই পরিস্থিতিতে, প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের পর আমি ভালোটাকেই বেছে নিলাম। কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার শক্তি

যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি। হ্যাঁ, বয়স্ক, বন্ধুজন পরিবৃত সম্মানিত ডাক্তারকেই আমি বেশি পছন্দ করেছিলাম। বিদায় জানালাম তরুণ, দুঃসাহসিক হাইডকে যার মাধ্যমে আমি আমার গোপন আনন্দগুলি উপভোগ করতাম। এই বেছে নেয়াটার মধ্যে কিছুটা দ্বিধা ছিল প্রমাণ, সোহোর বাড়িটা আমি ছেড়ে দিই নি বা হাইডের পোশাকগুলোও নষ্ট করে ফেলি নি।

দুইমাস আমি দৃঢ়ভাবে জেকিল হয়ে রইলাম। দুইমাসের জন্য আমি কঠোর সংযম পালন করলাম। প্রতিজ্ঞা পালন করলাম কঠোরভাবে।

কিন্তু ধীরে ধীরে তা একঘেঁয়ে লাগতে লাগল। হাইডের বন্ধনহীন যথেচ্ছ আমোদ-প্রমোদের জীবনযাত্রার প্রতি আমার আকর্ষণ আবার দুর্বার হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে আমি ওষুধ তৈরি করে পান করলাম।

যে দুর্দম পশুকে এতদিন বন্দি করে রেখেছিলাম ক্রুদ্ধ গর্জনে সে বেরিয়ে এল। যে কোনো হিংস্র নিষ্ঠুর আচরণের জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠল। অনেকদিনের অবদমিত কামনা আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলল। এমনি সময়, পথের মধ্যে দেখা হল বেচারা স্যার ড্যানভার্সের সঙ্গে। আমি তাকে নিদারুণ পৈশাচিক আনন্দে পেটালাম ও প্রত্যেকটা আঘাত উপভোগ করলাম। আমি তখন সমস্ত স্বাভাবিকতার বাইরে। শিশুরা খেলনা ভেঙে যে আনন্দ পায়, নিষ্ঠুরতম কাজেও আমার সেই আনন্দ।

আমার হৃদয়ে তখন নরকের আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি মহা আনন্দে লোকটার ওপর চড়াও হলাম। নারকীয় উল্লাসে আঘাতের পর আঘাত করলাম। রাগটা স্তিমিত হলে টের পেলাম—মহা সর্বনাশ হয়েছে। নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শাস্তি আমাকে পেতে হবে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য দ্রুত আমি সোহো স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরে এলাম। নিজের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার জন্য কাগজপত্র, চেকবই সব পুড়িয়ে ফেললাম। তারপর জেকিলের বাড়িতে ফিরে এসে ওষুধ পান করলাম। পরিবর্তনের যন্ত্রণাময় স্তর অতিক্রম করে আবার জেকিলের আবির্ভাব ঘটল। দুঃখ ও অনুতাপে আমার চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বারবার মনে পড়ছে, সন্ধ্যাবেলার বীভৎস সেই ঘটনার কথা। একটি দুঃসহ স্মৃতি আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। আমার পাপের বিকৃত চেহারাটা মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল বারবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দুঃখের অনুভূতি কমে এল তখন একধরনের আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়ল আমার মনে। কারণ হাইড বলে এখন আর কেউ নেই। আমার দ্বৈত অস্তিত্বের সমস্যা মিটে গেছে। এখন আমি অবশ্যই আমার মর্যাদাময় জীবনে ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ফিরে যাব। জীবনকে

স্বাভাবিক করার জন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন করলাম। হাইডরূপে যাতায়াতের জন্য আমি পেছনের যে দরজাটা ব্যবহার করতাম সেটাকে তালাবন্ধ করে, চাবিটা পায়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেললাম।

পরদিনই খবরে পড়লাম, স্যার ড্যানভার্স কেরুকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি একজন বহু পরিচিত, সম্মানিত জন প্রতিনিধি। হাইডের অপরাধের কথা সবাই জেনে গেছে এবং পুলিশ হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে। খবরটা শুনে একই সঙ্গে দুঃখিত ও আনন্দিত হলাম আমি। কারণ ফাঁসির মঞ্চের ভয়েই হাইডের পুনরাবির্ভাব আর সম্ভব নয়। মুহূর্তের জন্য হাইড আত্মপ্রকাশ করলেও লোকে তাকে শেষ করে দেবে।

আমার অতীত অপরাধের কারণে আমি ভবিষ্যতে কিছু ভালো কাজ করব বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলাম। আমার পুরনো ও সৎ বন্ধুদের সান্নিধ্য আমি আবার উপভোগ করতে লাগলাম। নিষ্পাপ নির্দোষ জীবন আমার ভালোও লাগছিল।

কিন্তু দ্বৈত জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আমার জানা ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই ভেতরের পশুশক্তিটা আবার দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। উচ্ছৃঙ্খলা পাপ-প্রবৃত্তিগুলো প্রকাশের পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু হাইডকে পুনর্জীবিত করার ইচ্ছে আমার ছিল না।

সেদিন জানুয়ারির রৌদ্র ঝলমলে এক সকালবেলায় আমি রিজেন্ট পার্কে বসেছিলাম। পরিষ্কার, মন মাতানো ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করছি। আকাশ ছিল নীল, মেঘমুক্ত এবং গাছে গাছে পাখির কলতান। আমার ভেতরের আদিম জন্তুটা তখন স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে।

হঠাৎ সারা শরীরে আমি তীব্র কাঁপুনি অনুভব করলাম। ভীষণ বমি বমি ভাব। আমার মন মেজাজ তিক্ত হয়ে গেছে। একটু পরেই টের পেলাম লজ্জা-ভয়-চিন্তাশূন্য এক ব্যক্তি আমি। লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার শরীর ছোট হয়ে গেছে। গায়ের পোশাকগুলো বেঢপভাবে ঝুলছে। হাঁটুর ওপর রাখা হাতটা শীর্ণ ও রোমশ। আমি আবার এডওয়ার্ড হাইডে রূপান্তরিত হয়েছি। এক মুহূর্ত আগেও আমি ছিলাম একজন শ্রদ্ধেয়, ধনী ও অতিশয় প্রিয় ভদ্রলোক। নিতান্ত একং নির্বিঘ্ন ব্যক্তি। এখন আমি একজন নিরাশ্রয়, ফেরারী আসামি। যাকে খুনের অপরাধে খোঁজা হচ্ছে। যার ফাঁসি হতে বাধ্য।

কিছুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে গেলাম আমি। জেকিল হয়তো এ অবস্থায় একেবারেই ঘাবড়ে যেত। কিন্তু হাইড ছিল ভয়ঙ্কর, চতুর। মুহূর্তের মধ্যে সে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিল। ওষুধগুলো রয়েছে ল্যাবরেটরিতে। সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ চাকর বাকরেরা হাইডকে দেখতে পেলে

পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। পেছনের দিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ সে পথ আমি নিজেই আটকে দিয়েছি। এখন অন্য কারো সাহায্য দরকার আমার। প্রথমেই মনে পড়ল ড. ল্যানিয়নের কথা। মনে পড়ল, এখনো আমি নিজের হস্তাক্ষরে চিঠি লিখতে পারি।

আমি পোশাকের হাতা গুটিয়ে ঠিকঠাক করে নিলাম। মুখটা ঢাকার ব্যবস্থা করলাম ও একটা গাড়ি নিয়ে পোর্টল্যান্ড স্ট্রিটে একটা পরিচিত সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম। আমি মনের চঞ্চলতা যতদূর সম্ভব দমিয়ে রেখে কাগজ কলম নিয়ে দুখানা চিঠি লিখলাম। সরাইখানার লোক দিয়েই একখানা ল্যানিয়নের কাছে অন্যখানা আমার পরিচারক পুলের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। প্রাণভয়ে ভীত, ক্রুদ্ধ, মরিয়া হাইডের সে আরেক রূপ।

সারাদিন হাইডরূপী আমি সরাইখানার ছোটঘরে বন্দির মতো কাটালাম। তারপর যখন লন্ডনে রাত্রি নেমে এল তখন একটা ভাড়া গাড়িতে করে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গাড়ির চালক যখন সন্দেহজনকভাবে আমাকে দেখতে লাগল তখন আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম। তারপর বেঢপ পোশাক পরে সেইসব পথে হাঁটতে লাগলাম যেখানে লোকজনের চলাচল খুব কম। আমার মনে তখন ঝড়ের উদ্দাম প্রবাহ—মধ্যরাত হতে আর কত বাকি!

ল্যানিয়নের বাড়িতে গিয়ে আবার নিজের চেহারা ফিরে পেলাম। ল্যানিয়ন এই বিস্ময়কর রূপান্তর দেখে ভয় পেল। সাংঘাতিক আতঙ্কে সে প্রায় মূর্ছা যায় আর কি!

এই বিষয়টি নিদারুণ মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করল আমাকে। পরিবর্তন এল আমার মনে। ফাঁসির মঞ্চের ভয় নয়, হাইডে রূপান্তরিত ঘোরের মধ্যেই যেন ল্যানিয়নের তীব্র তিরস্কার শুনলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ শান্তিতে ঘুমালাম আমি। পরদিন সকালে যখন জেগে উঠলাম তখন টের পেলাম, শরীর দুর্বল লাগলেও মনটা তখন বেশ ঝরঝরে।

সকালে নাস্তার পরে বাগানের মধ্যে পায়চারি করছিলাম আমি। হঠাৎ আবার সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রত্যেকবার হাইডে রূপান্তরের আগে যেটা হয়। শুরু হল সেই অসহ্য যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরি রুমে এসে ঢুকলাম। পুনরায় জেকিল হওয়ার জন্য আমি দ্বিগুণমাত্রার ওষুধ খেলাম।

কিন্তু হায়!

দুঘণ্টা পরে আবার সেই যন্ত্রণা ফিরে এল এবং আবার আমায় ওষুধ খেতে হল। এরপর থেকে শুরু হল ঘন ঘন রূপান্তরের প্রবণতা। সেদিন থেকে প্রচণ্ড চেষ্টায় এবং নিয়মিত মাত্রায় ওষুধ সেবন করে আমি কোনোরকমে জেকিলের

চেহারা ধরে রাখতে পেরেছিলাম। যখন তখন আমি যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতাম ও হাইডে পরিণত হতাম। ঘুমিয়ে পড়লে কিংবা একটু ঘুম ঘুম ভাব লাগলেও জেগে উঠে দেখতাম—আমি হাইড হয়ে গেছি।

এইভাবে প্রবল মানসিক চাপে আমি ক্রমশ আরও বেশি অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়লাম। হাইড আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল এবং জেকিল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল ধীরে ধীরে।

জেকিল হাইডকে ঘৃণা করতে লাগল। জেকিলের হতাশা এবং হাইডের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব টের পেয়েছিল হাইড। হাইডের সম্পূর্ণ শয়তানি, বীভৎস শরীরের গঠন, ফাঁসিতে মরার ভয় সব মিশিয়ে জেকিল নিজেকেই ঘৃণা করতে শুরু করল। অন্যদিকে হাইড খুবই স্বার্থপর। সে অন্যভাবে জেকিলকে ঘৃণা করত। ফাঁসিতে লটকানোর ভয়ে সে জেকিলের শরীরের মধ্যে আশ্রয় নিত। জেকিলের ওপর এই নির্ভরতাকে সে ঘৃণা করত।

হাইড আমার বইয়ের পাতায় পাতায় কটু মন্তব্য লিখত। কিন্তু হায়—সে সবই যে আমার হাতের লেখা। আমার বাবার ছবি সে নষ্ট করে ফেলল। আমার চিঠিপত্র পুড়িয়ে দিতে লাগল। মৃত্যুভয় না থাকলে অনেক আগেই আত্মহত্যা করে সে আমাকে শেষ করত। কিন্তু জীবনের প্রতি ওর অপরিসীম ভালোবাসা। আমি নিজে আত্মহত্যা করে ওকে শেষ করে ফেলতে পারি—এই ভয়ে ও মাঝে মাঝে খুব মুষড়ে পড়ত। তা দেখে আমার করুণাই হত।

একই সত্তার মধ্যে দুটি সত্তার পারস্পরিক বিরোধী খেলায় আমি ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং মৃতপ্রায়। একজন জেকিল—সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। অপরজন হাইড—যাকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছে। ধরা পড়লেই ফাঁসি। এই আশ্চর্য দ্বৈত চরিত্র বিলীন হয়ে রয়েছে একটি চরিত্রের মধ্যেই।

আমার এই বিবরণ আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বে আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি এমন নরক যন্ত্রণা যেন কাউকে আর ভোগ না করতে হয়। আমার এই শাস্তিভোগ হয়ত দীর্ঘদিন ধরে চলত। কিন্তু ইতিমধ্যে চরম সর্বনাশের শিকার হলাম আমি। নিজের চেহারা ও স্বভাব থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে হল আমাকে। প্রথমবার যে রাসায়নিক লবণটা আমি আনিয়েছিলাম তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দোকান থেকে নতুন করে লবণ আনিয়ে ওষুধটা বানালাম। পান করলাম কিন্তু কোনো ফল হল না। আমি রাসায়নিক লবণের খোঁজে পুলকে লন্ডনের সর্বত্র পাঠিয়েছি কিন্তু ফল কিছু হল না। ওষুধের মিশ্রণে বুদবুদ কাটে, রঙ বদলায় কিন্তু ধোঁয়া ওঠে না। এখন আমি বিশ্বাস করি—আমার প্রথম পাওয়া লবণটা ভেজাল ছিল। সেই অজানা ভেজাল লবণের কারণেই অবিশ্বাস্য শক্তির

ওষুধটা তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। শেষ পর্যন্ত সামান্য যে লবণের গুঁড়ো অবশিষ্ট ছিল সেটার প্রতিক্রিয়াতেই আমি এখনো আমার জবানবন্দি লিখতে পারছি। এই শেষবারের মতো হেনরি জেকিল নিজের মতো করে ভাবতে পারছে। আয়নায় নিজের নিষ্পাপ চেহারাটা দেখতে পারছে। লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে। জবানবন্দি যে এখনো পর্যন্ত লিখে যেতে পারছি সেটা আমার পরম সৌভাগ্য। কারণ লিখতে লিখতে যদি আমি হাইড হয়ে যাই তাহলে সে নিশ্চয়ই এটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

আর কেবল আধা ঘণ্টা বাকি।

তারপরই আমি চিরতরেই হাইড হয়ে যাব। তখন এই আবদ্ধ ঘরে বসে ভয়ে ভয়ে আমি কাঁদব। ঘরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ করে বাইরের শব্দ শুনে আতঙ্কে চমকে উঠব।

হাইড কি ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেবে? নাকি শেষ মুহূর্তে নিজেকে মেরে ফেলার সাহস দেখাবে সে? ঈশ্বরই কেবল তা জানেন। অবশ্য আমার কিছু যায় আসে না তাতে। কারণ এটাই আমার মৃত্যুর আসল সময়। পরে যাই ঘটুক, অন্য ব্যক্তিবিশেষের ঘটনা সেটা। তার ফল ভোগ আমাকে করতে হবে না। সেটার ফল ভোগ করবে হাইড।

সুতরাং, এখানেই আমি শেষ করছি। অসুখী হেনরি জেকিলের জীবনের বৃত্তান্ত এখানেই শেষ। এই স্বীকারোক্তি আমি সিল করে রাখলাম।

—হেনরী জেকিল

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।